অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ

তৃতীয় খণ্ড

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

70288
15/4/80

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

—বারো টাকা—

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন : চুনী বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রণ : ন্যাশনাল হাফটোন

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে
এস. এম. মাইতি কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীসারদা প্রেস, ৬৫ কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ৯ হইতে পি. কে. পাল কর্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

'তোমারি নাম বলব, বলব নানা ছলে।' আর কিছু না হোক, পাকে-প্রকারে কিছু কৃষ্ণনাম হরিনাম রামনাম গৌরনাম বলা হল লেখা হল দেখা হল এইটুকুই যা লাভ। সুদুরাচারও ভগবানের কাছে বর্জনীয় নয়। নামাভাসেই তার পাপদোষের খণ্ডন হবে, জাগবে কৃষ্ণপ্রেম। 'বিনা প্রয়োজনের ডাকে ডাকব তোমার নাম, সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই পুরবে মনস্কাম।' তাই নাম করতেই ভক্তি এসে যায়, আবার ভক্তি ভাবতে নাম দেখা দেয়। এই নাম-ভক্তিই একসঙ্গে চৈতন্য-নিত্যানন্দ। এ কথার ইতি নেই, অন্ত নেই, মুখর শেষ হলে মৌনে এর ঝঙ্কার হয়, আবার মৌন থেকে মুখরে স্ফুরিত হয়ে ওঠে। 'অন্তবিহীন লীলা তোমার নূতন নূতন হে।'

অচিন্ত্যকুমার

তৃতীয় খণ্ড লিখতে প্রধানত নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলীর উপর নির্ভর করেছি :

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মূলগ্রন্থ ও শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ-কৃত তার টীকা

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ-প্রণীত অমিয়-নিমাই চরিত

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দসহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপাস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

'পতিতপাবনহেতু তোমার অবতার।
আমি বহি জগতে পতিত নাহি আর॥
আমা উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে।
পতিতপাবন তুমি, সবে তোমা-বিনে॥
আমা উদ্ধারিয়া যদি দেখাও নিজ বল।
পতিত-পাবন-নাম তবে সে সফল॥
সত্য এক বাত কঁহো শুন দয়াময়।
মো বিনু দয়ার পাত্র জগতে না হয়॥
মোরে দয়া করি কর অদয়া সফল।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখুক তোমার দয়াবল॥'

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ

সন্ন্যাসগ্রহণের পর ছ'বছর যে লীলা করলেন তা প্রভুর মধ্যলীলা। শেষ আঠারো বছরের লীলার নাম অন্ত্যলীলা। মধ্যলীলায় প্রভু অনেক তীর্থ ভ্রমণ করেছেন কিন্তু অন্ত্যলীলায় নীলাচলের বাইরে পা বাড়ান নি। অন্ত্যলীলার আঠারো বছরই নীলাচলে।

বৃন্দাবন থেকে প্রভু নীলাচলে এসেছেন এই সংবাদ পৌঁছুল গৌড়ে। স্বরূপ দামোদরই পাঠালেন সংবাদ। গৌড়ীয় ভক্তেরা সকলেই আনন্দিত। সকলে চলল শ্রীক্ষেত্রে গৌরমিলনের আকাঙ্ক্ষায়। শচীমাতাও আনন্দিত। মন বলে উঠল, চলো তুমিও চলো। কিন্তু তিনি কী করে যান? বিষ্ণুপ্রিয়াকে তবে কে দেখে?

প্রভুর আজ্ঞায় বৃন্দাবনে আছে রূপ। তার সেখানে কৃষ্ণলীলা নাটক লেখবার অভিলাষ হল। গ্রন্থারম্ভের মঙ্গলাচরণ ও নান্দীশ্লোক লিখে ফেলল। কিন্তু প্রভু যদি নীলাচলে গিয়ে থাকেন আমিও তবে সেইখানে গিয়ে আশ্রয় নিই। অনুপম বললে, আমিও যাব। দুই ভাই প্রয়াগ হয়ে কাশী হয়ে পৌঁছুল গৌড়ে। গৌড় থেকেই যাত্রা করব নীলাচল।

এমন বিধান, গৌড়ে এসে অনুপম অসুস্থ হয়ে পড়ল। রূপ অনেক পরিচর্যা করল কিন্তু অনুপম তারকব্রহ্ম নাম করতে-করতে গঙ্গাপ্রাপ্ত হল।

রূপের তাই দেরি হয়ে গেল, গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গ নিতে পারল না। সে চলল একাকী। চলল অনন্তলক্ষ্য।

পথে যেতে-যেতে সে তার নাটকের কথা ভেবেছে, কখনো বা খসড়া করেছে। নাটকের কথাই তো কৃষ্ণের কথা। আর কৃষ্ণ এখন কোথায় সশরীরে?

নীলাচলে।

পথে সত্যভামাপুরে একরাত্রি বিশ্রাম করল রূপ। রাত্রে স্বপ্ন দেখল। দেখল এক দিব্যরূপা নারী তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বলছে, 'আমাকে চিনতে পারলে?'

'পেরেছি।'

'কৃপা করে দর্শন দিয়েছি তোমাকে।' বললে সে অলোকরূপসী: 'আমি সত্যভামা।'

'আদেশ করুন।'

'আমার নাটক আলাদা করে লেখ। ব্রজলীলা আর দ্বারকালীলা মিশিয়ে দিও না। আলাদা করে লিখলেই তোমার দুই নাটক সার্থক হবে।'

এই নির্দেশের তাৎপর্য বুঝতে পারল রূপ। যেন মাধুর্য আর ঐশ্বর্যকে একত্র না করি।

ব্রজে কৃষ্ণের লীলা মাধুর্যময়ী আর দ্বারকায় ঐশ্বর্যময়ী। ব্রজে ঐশ্বর্য মাধুর্যের অনুগত, কিন্তু দ্বারকায় ঐশ্বর্য স্বতন্ত্র, মাধুর্যনিরপেক্ষ। সুতরাং এদের বর্ণন-বন্ধন আলাদা হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

ভাবতে-ভাবতে হরিদাসের বাসায় এসে উঠল রূপ। কাশী মিশ্রের বাড়ির দক্ষিণে নির্জনে হরিদাসের বাসা।

আগে হরিদাসকে দেখি পরে মহাপ্রভুকে দেখব। আগে ভক্তকে স্বীকার করি পরে ভগবানকে স্বীকার করব।

ভাগবতেও আগে ভক্তের কথা পরে ভগবানের।

রূপে অশেষ দৈন্যভাব। সে দৈন্যভাবেই রূপবান। এ দৈন্য মৌখিক নয়, এ একেবারে অস্থি-মজ্জায়। অন্তরের স্তরে-স্তরে। উদ্যোগ করে প্রথমেই প্রভুর কাছে গেলে বোধ হয় অহঙ্কারের মত দেখায়। তাই আগে হরিদাসের কাছে গিয়ে বসি। ভক্তের কৃপা না পেলে ভগবানের কৃপা পাব কী করে?

'আরে, তুমি?' হরিদাস লাফিয়ে উঠল: 'প্রভু আমাকে আগেই বলেছিলেন তুমি আজ আসবে।'

'কোথায় বললেন?'

'আমার বাসায়, এইখানে।'

'এইখানে?'

'হ্যাঁ, প্রত্যহ প্রাতে জগন্নাথের উপলভোগ দর্শন করে আমার বাসায় এসে পদ-ধূলি দেন। তুমি ঠিক সময়ে এসে পড়েছ। প্রভুর সময় হয়েছে আসবার।'

আর বলতে-বলতেই প্রভু এসে উপস্থিত।

উপস্থিত হবার সঙ্গে-সঙ্গেই রূপ দণ্ডবৎ হয়ে পায়ে পড়ল। হরিদাসও দণ্ডবৎ হল। প্রভু আগে হরিদাসকে আলিঙ্গন করলেন। পরে রূপকে।

তারপরে তিন জনে বসলেন ঘন হয়ে। কুশল প্রশ্নের পর শুরু হল কৃষ্ণকথা।

কৃষ্ণ আমার নিত্যকিশোর। 'কিশোরস্বরূপ কৃষ্ণ।' তার প্রৌঢ়ত্ব নেই বার্ধক্য নেই জরত্ব নেই বয়োমালিন্য নেই। 'রসময় মূর্তি—সাক্ষাৎ শৃঙ্গার।'

রসের সদন—অশেষ বিশেষ রস আস্বাদন করছে। পূর্ণরসস্বরূপ, পূর্ণানন্দস্বরূপ। কৃষ্ণনামে জানাচ্ছেন। কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণে লোভ উপজায়।

'তারপর সনাতনের খবর কী?'

'তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি।' বললে রূপ, 'আমি এলাম গঙ্গাপথে আর উনি রাজপথ দিয়ে গিয়েছেন।'

'আর অনুপম?'

'গৌড়ে গঙ্গাতীরে দেহ রেখেছে।'

প্রভু রূপকে হরিদাসের বাসায় থাকতেই উপদেশ করলেন। উপদেশ করে চলে গেলেন নিজগৃহে।

গৌড়ীয় ভক্তরা আগেই চলে এসেছে, তাদের নিয়ে প্রভু এলেন রূপের কাছে। রূপ সকলকে দণ্ডবৎ করল, ভক্তরাও আলিঙ্গন করল রূপকে।

অদ্বৈত ও নিত্যানন্দকে প্রভু বললেন, 'তোমরা কায়মনে রূপকে কৃপা করো। যাতে তোমাদের কৃপাতে রূপের প্রাণে শক্তিসঞ্চার হয়। আর শক্তিসঞ্চার হলেই তো রূপ কৃষ্ণরস ও কৃষ্ণভক্তি সম্যক ব্যাখ্যা করতে পারবে।'

ভক্তকৃপাস্পর্শে রূপের মধ্যে তত্ত্বপ্রকাশিকা শক্তি প্রস্ফুটিত হোক।

প্রভু যাকে কৃপা করেছেন তাকে স্নেহ করতে কার অসাধ হবে?

প্রত্যহই প্রভু এসে হরিদাস আর রূপের সঙ্গে মিলিত হন, ইষ্টগোষ্ঠী করেন—অর্থাৎ করেন কৃষ্ণালোচনা। মন্দির থেকে যে প্রসাদ পান তাই বণ্টন করে দেন।

রথের আগের দিন তো ভক্তদের নিয়ে গুণ্ডিচামন্দির মার্জন করলেন, আই-টোটার বাগানে করলেন বন্যভোজন। রূপ দেখল ভক্তরা প্রসাদ পাচ্ছে আর বলছে হরি-হরি। রূপের পাশে হরিদাস, হরিদাসও দেখল। ওরা, রূপ আর হরিদাস, নিজেদের হেয় ও অস্পৃশ্য মনে করে, তাই ভক্তদের সমান পঙক্তিতে না বসে দূরে বসেছে। দূরে বসেই দেখল ভোজনলীলা। সকলের আহার হয়ে গেলে গোবিন্দকে দিয়ে প্রভু পাঠিয়ে দিলেন তাঁর ভুক্তাবশেষ। প্রভুর শেষ প্রসাদ দেখে ওদের আনন্দ উত্তাল হয়ে উঠল। আর আমাদের পায় কে! প্রেমে মত্ত হয়ে নাচতে লাগল দু'জনে।

আরেক দিন, রূপের বাসায়, ভক্ত সমাবেশে প্রভু বলে উঠলেন: 'কৃষ্ণকে ব্রজের থেকে বার কোরো না। ব্রজ ছেড়ে কৃষ্ণ কোথাও কখনো যায় নি।'

এর তাৎপর্য কী?

তাৎপর্য, প্রকট লীলায় কৃষ্ণ ব্রজ ছেড়ে অন্যত্র যান কিন্তু অপ্রকট লীলায়

বৃন্দাবনেই বন্দী থাকেন। অর্থাৎ যে ঘটনার উপলক্ষে কৃষ্ণকে ব্রজ ছেড়ে অন্যত্র যেতে হচ্ছে সে সব ঘটনা তোমার নাটকে বর্ণনা কোরো না। শুধু ব্রজলীলাতেই আবদ্ধ রেখো। তোমার নাটক ব্রজলীলার শুরু, ব্রজলীলায় শেষ। তাতে মথুরা-দ্বারকার কীর্তি-কাহিনী যেন না থাকে। তোমার নাটকে বৃন্দাবনই নন্দিত হোক।

রূপ বিস্ময় মানল। সত্যভামা বলে গেল, আমার পুরলীলার নাটক আলাদা লেখ। এখন রাধাবিভাবিতচিত্ত প্রভু বলছেন, ব্রজলীলার নাটক যেন পৃথক হয়। দুই ধামের দুই কৃষ্ণপ্রেয়সী ভিন্ন ভাবে একই আদেশ করলেন।

তাই হবে।

দুই ভাগে ভাঙব নাটককে। পৃথক পৃথক নান্দী প্রস্তাবনা লিখব। ঘটনা-বিন্যাসও দু'রকম। দু'রকমের ভাবগৌরব।

চলো রথাগ্রে প্রভুর নৃত্য দেখে আসি।

কিন্তু নৃত্যের সঙ্গে-সঙ্গে ঐ কোন শ্লোক তিনি আবৃত্তি করছেন? 'যঃ কৌমারহরঃ—' সবই সেই রকম আছে, আমিও আছি, আমার মনোহারী প্রেমিকও আছেন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও ম্লান হয় নি, তবু প্রথম যৌবনোন্মেষে যে জায়গায় দু'জনের মিলন হয়েছিল সেই জায়গায় সেই মিলনটির জন্যেই আমি উৎকণ্ঠিত।

প্রভু ভাবছেন তিনি রাধা আর জগন্নাথ কৃষ্ণ। আর এ স্থান যেন কুরুক্ষেত্র। কুরুক্ষেত্রে মিলনে রাধার তৃপ্তি নেই, চলো, ব্রজে ফিরে যাই, আমাদের সেই নিভৃত নিকুঞ্জে, সেইখানে আমাদের সেই আদিম মিলনমুহূর্তটি কুড়িয়ে নিই।

প্রভু কেন এই শ্লোক পড়ছেন কে জানে!

রূপ জানে। রূপ বুঝেছে। সে তখুনি তার অর্থশ্লোক রচনা করল। 'প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ।' কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাধা বলছে সহচরীকে, দেখ, ইনি সেই বৃন্দাবনবিহারী কৃষ্ণ আর আমিও সেই রাধা। আমাদের এই মিলনও সুখদায়ক, দীর্ঘ বিরহের পর বলে এই মিলন প্রায় প্রথম সঙ্গমের মতই রমণীয়, তবু আমার মন সেই যমুনাপুলিনচারী কৃষ্ণকেই শুধু কামনা করছে। আর চাইছে এ স্থানের পরিবর্তে সেই মধুবন যেখানে কৃষ্ণ বাঁশি বাজাত আর ঘুরে বেড়াত আর যেখানে বাঁশির পঞ্চম স্বরে পুলিনকানন শিহরিত হত, রোমাঞ্চিত হত ধারণ করত মধুরিমা।

'সেই তাব সেই কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবন।
যবে পাই, তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥'

শ্লোকটি একটি তালপাতায় লিখে রূপ তা ঘরের চালের মধ্যে গুঁজে রাখল। সমুদ্রস্নান করতে গিয়েছে, প্রভু হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন। দেখলেন চালের মধ্যে তালপাতা গোঁজা। টেনে এনে দেখলেন তাতে একটি শ্লোক লেখা। আহা, কী মধুর সে শ্লোক। প্রভুর যে গোপন ভাব একমাত্র স্বরূপ দামোদরের জানা তা রূপ টের পেল কী করে?

স্নানান্তে ফিরল রূপ। এ কি, প্রভু দাঁড়িয়ে! দণ্ডবৎ করল আভূমি।

প্রভু অঙ্গনে নেমে এসে রূপকে এক চড় মারলেন। ক্রোধের চড় নয় স্নেহের চড়। দৃঢ় আলিঙ্গন করে ধরলেন। বললেন, 'তুমি আমার অন্তরের গোপন কথা কী করে জানলে? তোমাকে কে বোঝাল?'

শ্লোকটা পড়তে দিলেন স্বরূপকে। আশ্চর্য, কী করে জানতে পারল আমার নিগূঢ় তত্ত্ব?

'শুধু তোমার কৃপাশক্তিতে।' বললে স্বরূপ, 'তোমার কৃপা ছাড়া তোমার মনের ভাব কার সাধ্য কে বোঝে? শ্লোক উচ্চারিত হোক, শব্দের বাচ্যার্থ প্রাঞ্জল হোক, নিহিত সত্যকে বুঝতে হলে তোমার কৃপার দরকার।'

'হ্যাঁ,' সমর্থন করলেন প্রভু, 'প্রয়াগে যখন রূপকে দেখি, মনে হল এ যোগ্য পাত্র। তাই আমি একে কৃপা করে শক্তিসঞ্চার করেছি, ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে বহুবিধ উপদেশ দিয়েছি। রসতত্ত্ব সম্বন্ধে যেখানে যে বিশেষত্ব আছে তুমি একে বুঝিয়ে দিও।'

'ওর ঐ শ্লোক দেখেই আমি আপনার কৃপা বলে সিদ্ধান্ত করেছি।' বললে স্বরূপ: 'ফল দেখেই ফলের কারণও বোঝা যায়। কারণে যে গুণ বর্তমান তাই কার্যে প্রতিফলিত। রূপের প্রতিভা যেখানে কার্য আপনার কৃপাই সেখানে কারণ। ভগবানের কৃপা ছাড়া প্রতিভা অসম্ভব।'

হাঁসকে দময়ন্তী বললেন, তুমি এত সুন্দর হলে কী করে? অনুমান করো। স্বর্গে নদী বয়, সেই নদীতে স্বর্ণকমল ফোটে, সেই স্বর্ণকমলের মৃণাল আমি ভোজন করি। তাতেই আমার দেহের এই কান্তি-পুষ্টি, সৌন্দর্য-মাধুর্য।

শয়ন-একাদশী থেকে শুরু করে উত্থান-একাদশী পর্যন্ত চার মাসের নাম চাতুর্মাস্য। চাতুর্মাস্যের পর গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা দেশে ফিরে গেল। কিন্তু রূপ ফিরল না। প্রভুর চরণে শরণ নিয়ে থেকে গেল নীলাচলে।

একদিন নাটক লিখছে রূপ, প্রভু এসে উপস্থিত হলেন। প্রণাম-আলিঙ্গনের পর প্রভু জিগগেস করলেন, 'কী লিখছ?' বলেই এক পত্র ধরে টান মারলেন।

কী সুন্দর হস্তাক্ষর! যেন মুক্তোর সার। সপ্রশংস প্রভু অক্ষরের স্তুতি করলেন। যেমন অক্ষর তেমনি রচনা। কী অপূর্ব শ্লোক! 'তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং—'

'ত্ত' আর 'ণ্ড' এই দু'টি অক্ষর কী অমৃতে তৈরি বলতে পারো কেউ? এই দুটি শব্দ যদি একত্র হয়ে জিহ্বাগ্রে নাচতে আরম্ভ করে, ইচ্ছে হয় আরো শত শত মুখে শত শত জিহ্বায় এই নাচের আসর বসুক, যদি এক কানে তা প্রবেশ করে, ইচ্ছে হয় আরো শত শত কানে তা বিস্তৃত হোক, আর যদি একবার তা চিত্তপ্রাঙ্গণের সঙ্গিনী হয় অন্ত-অঙ্গ ইন্দ্রিয়ের শত শত ঘরে খিল পড়ে যাক।

অর্থাৎ এক মুখে কত বলব, অসংখ্য মুখ অসংখ্য জিহ্বা পাবার আকাঙ্ক্ষা হয়। দুই কানে নামসুধা কতটুকু পান করব, ধ্বনির অমৃত ধরবার জন্যে অসংখ্য কান দাও। আর ইন্দ্রিয়সমূহ কত প্রবল কত সক্রিয় কিন্তু নামের সামনে তাদের আর অস্তিত্ব নেই, তারা তখন মগ্নশান্ত বিলয়তন্ময়। নদীতে বান এলে যেমন খাল-বিল-জলা-নালা জলে একাকার হয়ে যায় তেমনি নামসমুদ্র উথলে উঠলে সমস্ত ইন্দ্রিয় ডুব মারে, তলিয়ে যায় অতলে। এমন কৃষ্ণ নাম কোন মধুতে প্রস্তুত?

হরিদাস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বললে, 'শাস্ত্রে আর সাধুমুখে কৃষ্ণনামের অনেক মহিমা শুনেছি কিন্তু এমনটি কখনো শুনিনি। যেমনি নাম তেমনি তার ব্যাখ্যা। মধুরে-মধুরে কোলাকুলি।'

এখন একবার রামানন্দ আর সার্বভৌম দেখুক। তারা কী বলে।

তাদের কাছে প্রভু রূপের গুণ বর্ণন করলেন। তোমরাও বিচার করো রূপ কেমন লিখেছে! ভাবে ছন্দে রসে কাব্যে কেমন উত্তরেছে তার রচনা!

ঈশ্বরের বোধ করি এই রকমই রীতি। ভক্তের কোনো ত্রুটিই গায়ে মাখেন না। নেন না কোনো অপরাধ। অল্প সেবাকেই বহু বলে মানেন। ভক্তের কাছে হারেন। ভক্তের হাতে দান করে দেন নিজেকে।

'ঈশ্বরস্বভাব—ভক্তের না লয় অপরাধ।
অল্প সেবা 'বহু' মানে, আত্মপর্যন্ত প্রসাদ।'

আর তিনি এমন, দুর্জনের প্রতিও অসূয়া প্রকাশ করেন না। তিনি স্বীয় স্বভাবেই নির্মলমতি।

ভক্তদের নিয়ে একদিন বসলেন রূপ-হরিদাসের বাসায়।

রূপকে বললেন, 'তোমার শ্লোক দুটি পড়ো।'

লজ্জায় মুখ লুকোতে চাইল রূপ। 'লজ্জাতে না পড়ে রূপ—মৌন ধরিল।' তখন স্বরূপ দামোদর পড়ল। 'প্রিয়ঃ সোঽহং কৃষ্ণঃ—'

সকলে চমৎকার মানল।

ভট্টাচার্য বললে, 'তোমার হৃদয়ের কথা তোমার কৃপা ছাড়া অন্যে জানবে কী করে? রূপ গোস্বামীতে যে তত্ত্ব উদ্ভাসিত হয়েছে সবই তোমার কৃপাস্পর্শে।'

'তা ছাড়া আবার কী।' সায় দিল রামানন্দ। বললে, 'আমার মত সামান্য মানুষে প্রভু শক্তি সঞ্চার করলেন। আর তাঁর কৃপাশক্তিতে আমি সে-সব সিদ্ধান্ত প্রকাশ করলাম যার অন্ত ব্রহ্মেরও দুর্লভ। একমাত্র তোমার প্রসাদেই,' প্রভুর দিকে তাকাল রামানন্দ: 'তোমার হৃদয়ের অনুবাদ সম্ভবপর।'

প্রভু রূপকে বললেন, 'আহা, দ্বিতীয় শ্লোকটি পড়ো যে শ্লোকে মানুষ শোক-দুঃখ ভুলে যায়—'

দ্বিতীয় শ্লোকটি রূপ নিজে পড়ল। 'তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে—'

সকলে ধন্য ধন্য করে উঠল।

'কী বই লিখছ,' জিগগেস করল রামানন্দ, 'যার মধ্যে আছে এই সিদ্ধান্ত-খনি?'

স্বরূপ বললে, 'কৃষ্ণলীলা। ব্রজলীলা আর পুরলীলা দুই লীলা আগে একত্র ছিল। এখন পৃথক হয়ে গিয়েছে। এখন বিদগ্ধমাধব আর ললিতমাধব। দুইই নাটক। বিদগ্ধমাধবে ব্রজলীলা আর পুরলীলা ললিতমাধবে। আর দুই নাটকেই পরিপূর্ণ প্রেমরস।'

॥ ৬৪ ॥

রামানন্দ বললে, 'তবে এবার নান্দী শ্লোক পড়ো।'

রূপ পড়তে লাগল।

'হরিলীলাকথা তোমার সমস্ত তৃষ্ণা, সমস্ত অতৃপ্ত ভোগবাসনা হরণ করুক। কী রকম সে কথা? যেন চিনিপাতা দই। তাতে ব্রজসুন্দরীদের প্রণয়কর্পূর মেশানো। তাতেই সুগন্ধি করা। এমন সে সুধা যা চন্দ্রসুধার মাধুর্যগর্বকে ম্লান করেছে। সে স্নিগ্ধ ও সুস্বাদু পানীয় সংসারপথশ্রান্ত সন্তপ্ত প্রাণীদের তৃষ্ণা দূর করে। দুর্বিষয়ের তৃষ্ণা।'

রামানন্দ বললে, 'এবার ইষ্টদেবের বর্ণন করো।'

প্রভু সামনে বসে, কী করে পড়ে? রূপ কুণ্ঠিত হয়ে রইল।

'সে কি, সঙ্কোচ কিসের ?' প্রভু আশ্বাস দিলেন : 'গ্রন্থের ফল সমস্ত বৈষ্ণব-সমাজকে শোনাও।'

রূপ পড়ল : 'পুরটসুন্দরদ্যুতি শচীনন্দন হরি সকলের হৃদয়কন্দরে স্ফুরিত হোন। যিনি উন্নত-উজ্জ্বলরসাশ্রিতা ভক্তিশ্রী করুণা করে বিতরণ করছেন—যে শ্রী বহুদিন ধরে সংসারে অনুপস্থিত।'

সকলে বলে উঠল : 'এই শ্লোক শুনে কৃতার্থ হলাম। রূপ, তুমি এই শ্লোক শুনিয়ে সকলকে কৃতার্থ করলে।'

রামানন্দ জিগগেস করল, 'তোমার নাটকে প্রস্তাবনা কী নিয়ে ? সূত্রধার এসে কী বলছে ?'

'বলছে, বসন্তকাল সমাগত। এবার পূর্ণচন্দ্র বিশাখা তারার সঙ্গে মিলিত হবেন।' 'অর্থাৎ', রূপ বললে, 'পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ রুচিরা রাধিকার সঙ্গে মিলিত হবেন।'

'তারপর বলো কী নাটকের প্ররোচনা ?'

শ্রোতাদের প্রশংসা করে তাদের উন্মুখ করার নাম প্ররোচনা। আর সেই সঙ্গে লেখকের দৈন্য জানানো।

'প্ররোচনা এই ভাবে।' রূপ বললে, 'সভাবোজ্জ্বল ভক্তরা এসে উপস্থিত হয়েছেন। গোপিনীবন্ধু কৃষ্ণ সজ্জিত হয়েছেন। বৃন্দাবনের রাসস্থলীও নৃত্য-কলাবিধির উপযুক্ত রঙ্গমঞ্চ হয়ে উঠেছে। মনে হয় আমার মত অভাজনেরও কিছু পুণ্যফল ছিল। হে বুধমণ্ডলী, আমি ক্ষুদ্র হলেও আমার কথা তুচ্ছ হবে না। কেন না সে কথা হরিগুণময়ী কথা, হরির গুণবর্ণনায় পরিপূর্ণ। সে কথা সিদ্ধার্থ-বিধাত্রী। আপনাদের যা অভীষ্ট এই কথা তারই সিদ্ধি এনে দেবে। নীচ জাতি পুলিন্দ যদি কাঠ ঘষে আগুন উৎপাদন করে সে আগুন কি স্তিমিত হয়, না কি সেই আগুনে সোনার অন্তর্মল দূরীভূত হয় না ? আমি লঘু হতে পারি কিন্তু আমার বিষয় লঘু নয়। আমি হীন হতে পারি কিন্তু আমার বিষয় গুণগরীয়ান।'

রামানন্দ বললে, 'তবে এবার প্রেমোৎপত্তির কারণগুলি বলো।'

'রতির আবির্ভাবের কারণ সাতটি। অভিযোগ, বিষয়, সম্বন্ধ, অভিমান, তদীয় বিশেষ, উপমা ও স্বভাব।'

অভিযোগ কি রকম ? বিশাখাকে বলছে রাধিকা, যমুনার পাড়ে গিয়ে দেখলাম, কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছে, এমন নির্লজ্জ, আমার অধরের দিকে লোলুপ চোখে তাকিয়ে আছে আর সতেজ লতার নতুন পাতা দংশন করছে। যেন দাঁতে পাতা কাটছে না, আমার হৃদয় কাটছে।

বিষয়? রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ এই পাঁচটি বিষয়। কৃষ্ণের রূপ দেখে, কৃষ্ণের মুখের তাম্বূল আস্বাদ করে, কৃষ্ণের গাত্রগন্ধে, কৃষ্ণের পদশব্দে বা বংশীধ্বনিতে বা কৃষ্ণের প্রত্যক্ষ স্পর্শে যে রতির উদয় তার নাম বিষয়।

সম্বন্ধ? বল বীর্য শৌর্য সৌন্দর্য শীল ও সৌশীল্য সম্পর্কে গৌরববোধই সম্বন্ধ। কৃষ্ণের লোকাতীত চরিত্র চিন্তা করলে কে ধৈর্য রক্ষা করবে? বলছে ব্রজাঙ্গনা। সেই রূপ ও গুণের কাছে কে না চাইবে নিজেকে উৎসর্গ করি?

অভিমান? মমতাবুদ্ধির আধিক্য থেকেই অভিমান। এক সখী এসে রাধিকাকে বলছে, তোমার কৃষ্ণ বহুবল্লভ, তোমার কৃষ্ণ লম্পট, নিষ্প্রেম, তার প্রতি তোমার অনুরাগ কেন? আর কোনো রূপগুণান্বিত ব্যক্তিকে বেছে নাও। রাধিকা বলছে, আমার অন্যে দরকার নেই, থাকুন অনেক পুরুষ, মাধুর্যের সমুদ্র, বৈদগ্ধ্যের পর্বত, গুণবতী রমণীরা তাদের বরণ করুক। আমার ঐ মাথায় শিখিপুচ্ছ, মুখে বাঁশি, গায়ে তিলকচিহ্ন সেই মনোহরেই একমাত্র রুচি। অন্যকে আমি তৃণতুল্য মনে করি। এই যে মনোভাব এইটিই অভিমান। আর এই অভিমানেই রতির উদ্ভব।

তদীয় বিশেষ হচ্ছে কৃষ্ণের সংশ্লিষ্ট কোনো বস্তু। যেমন কৃষ্ণের গোষ্ঠ, কৃষ্ণের গাভী, কৃষ্ণের প্রিয়জন, কৃষ্ণের পদচিহ্ন।

কেউ কৃষ্ণ সেজেছে বা কেউ কৃষ্ণলীলার অভিনয় করছে তা দেখেও রতির উদ্রেক হতে পারে। এর নাম উপমা।

আর স্বভাব? কোনোই কারণ নেই, আপনা-আপনি এসে হঠাৎ দেখা দেয়। আর সব যে রীতি বলা হল সে লৌকিক রীতি। আসলে কৃষ্ণরতি স্বাভাবিকী। রাধিকার কৃষ্ণরতি নিত্যসিদ্ধ।

রামানন্দ প্রশ্ন করল: 'পূর্বরাগবিকার কী বলো? কাকে বলে চেষ্টা? কী বা কামলেখন?'

'নায়ক-নায়িকার সঙ্গমের আগে যে দেখাশোনার স্বাদ তাই পূর্বরাগ। আর শঙ্কা ব্যাধি শ্রম ক্লম দৈন্য অসূয়া চিন্তা নিদ্রা জড়তা উন্মাদ নির্বেদ ঔৎসুক্য মোহ ও মূর্তি—এ-সবই বিকার। শরীর চাঞ্চল্যই চেষ্টা আর প্রেমপত্রই কামলেখন।'

রাধিকার সঙ্গে কৃষ্ণের তখনো দেখা হয় নি, কৃষ্ণের নাম শুনেছে, বাঁশি শুনেছে, আর ছবি দেখেছে। ভিন জনের প্রতি আমার রতি জঞ্জাল, ছি ছি, আমার মরণই শ্রেয়। রাধিকা কাঁদছে আর বলছে ললিতাকে। 'কষ্টং ধিক

পুরুষত্রয়ে রতিযুগ্মতে মুক্তিং প্রেষণীং। এইখানে নাম, ধ্বনি আর চিত্রপট তিন বস্তুই রাগোৎপত্তির হেতু।

রাধাহৃদয়বেদনা দুঃসাধ্য। এর চিকিৎসা শুধু চিকিৎসকের নিন্দা। এই ব্যাধিই পূর্বরাগের বিকার।

কৃষ্ণের কাছে পত্র পাঠাল রাধা : তুমি চিত্রপট রূপ ধারণ করে আমার মন্দিরে বাস করছ। তোমাকে দেখলেই আমার চিত্তবিকার ঘটে, ভয়ে আমি পালিয়ে যাই, কিন্তু কোথায় যাব, যেখানে যাই সেখানেই তোমার ছবি দেখি। সর্বত্রই তুমি এসে আমার পথরোধ করে দাঁড়াও। সর্বত্রই তোমার স্ফূর্তি, তোমার উদ্দীপন।

ময়ূরপুচ্ছ দেখে রাধিকা কাঁদছে, গুঞ্জাবলী দেখে শোকাকুল হয়ে আর্তনাদ করছে, কখনো বা ছুটোছুটি করছে পাগলের মত। কোনো দুষ্ট গ্রহ তাকে নিশ্চয়ই ভর করেছে। কে জানে রাধিকার নবানুরাগই এই দুষ্ট গ্রহ।

রাধিকার দুঃখে বিশাখা কাঁদছে। তুমি কেন কাঁদছ? রাধিকা বলছে বিশাখাকে, 'কৃষ্ণ যদি আমার প্রতি অকরুণ, তাতে তোমার কী অপরাধ? আমিই মরব। আমার মৃতদেহকে তমালের ডালে এমনি করে বেঁধে দিও যেন আমি তাকে আমার ভুজবল্লরী দিয়ে আলিঙ্গন করে আছি। আমার এই মিলনেচ্ছাকে বৃন্দাবনে অবিনশ্বর করে রেখো।'

রামানন্দ বললে, 'এবার তবে প্রেমের স্বভাব কী বলো।'

'প্রেমে যে পরিমাণে সুখ সেই পরিমাণে দুঃখ। বিষ আর অমৃত এক সঙ্গে।'

'এই প্রেমের আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্বণ
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন।
সেই প্রেম যার মনে তার বিক্রম সে-ই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন।'

'সহজ প্রেম, স্বাভাবিক প্রেমের লক্ষণ কী?'

রূপ বললে, 'লক্ষণ, প্রিয়ের দোষে-গুণে প্রেমের দোষে-গুণে প্রেমের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। প্রিয় যদি স্তুতি করে, মনে হয় বুঝি উপেক্ষা করছে আর যদি নিন্দা করে, মনে হয় পরিহাস। উপেক্ষায় দুঃখ, পরিহাসে আনন্দ।'

কৃষ্ণের উৎসঙ্গ-সুখের আশায় গুরুলজ্জা শিথিল করে দিলাম, রাধিকা সখীদের কাছে বিলাপ করছে, তোমরা প্রাণের চেয়েও সুহৃত্তম তোমাদেরই বা কত ক্লেশ দিলাম, সাধ্বীসেবিত মহান পাতিব্রত্য ধর্মেরও সম্মান রাখলাম না, তবুও কৃষ্ণ

আমাকে উপেক্ষা করল, তারপরেও পাপীয়সী আমি বেঁচে আছি, আমার ধৈর্যকে ধিক। তারপর বলছে কৃষ্ণের উদ্দেশে, এ কী তোমার ঠিক হল? নিজের বাল্যস্বভাবে ঘরের মধ্যে আমরা খেলা করি, ভালো-মন্দ ভদ্র-অভদ্র কিছুই জানি না, আমাদের এ-রকম নিরাশ্রয় অবস্থায় টেনে আনা কি উপযুক্ত হয়েছে? তারপর টেনে এনে উদাসীন হয়ে থাকা কি আর তোমার পক্ষে সঙ্গত?

ললিতা বলছে, অন্তরক্লেশে কলঙ্কিত হয়ে যমপুরীতে চললাম, আর উনি এখনো প্রবঞ্চকের হাসি হাসছেন। হে মেধাবিনী রাধিকে, এই একটা গম্ভীরকপট আভীরপল্লীর ধূর্তের সঙ্গে তোমার কী করে প্রেম হল?

দেবী পৌর্ণমাসী কৃষ্ণকে বললে, 'কৃষ্ণ, তুমি সমুদ্র, আর রাধিকা বাহিনী, নদী। ধর্মসেতু ভেঙে দিয়ে সে এসেছে। বেদধর্ম লোকধর্ম আর্যপথ স্বজন ভবন সব সে বিসর্জন দিয়েছে। শুধু তোমাতে মিলিত হবার জন্যে। ছেড়েছে ধবতরু বা পতিচ্ছায়ার সান্নিধ্য, লঙ্ঘন করেছে সমস্ত গুরু-পর্বত। আর তুমি কিনা কপট বাকচাতুরীতে তার প্রতি বিমুখতা দেখাচ্ছ?'

সকলে একবাক্যে বলে উঠল: 'চমৎকার।'

রামানন্দ প্রশ্ন করল: 'বৃন্দাবনের কেমন বর্ণনা করলে? মুরলীধ্বনির? আর কৃষ্ণ রাধিকাকেই বা কী রকম চিত্রিত করলে?'

কৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে বলছে, মধুমঙ্গল, দেখ আম্রমুকুল থেকে মকরন্দ ক্ষরিত হচ্ছে, তার সুগন্ধে-মধুরে আকৃষ্ট হয়ে ভ্রমর এসে বন্দীকৃত হচ্ছে, চন্দনগিরির মন্দানিলে আন্দোলিত বৃন্দাবন, আমার অতুল আনন্দের আস্পদ।

এই বৃন্দাবন আমার ইন্দ্রিয়ের আনন্দবর্ধন। কোথাও ভ্রমরীর গান, কোথাও অনিলভঙ্গির শীতলতা, কোথাও বল্লীলাস্য বা লতানৃত্য, কোথাও মল্লীপরিমল বা মল্লিকা ফুলের গন্ধ, কোথাও বা রসভর দাড়িম্বের স্তূপ। ভ্রমরীর গান কানের তৃপ্তি, শিশিরবায়ুর স্পর্শ ত্বকের, লতানৃত্য চোখের, মল্লিকাগন্ধ নাকের আর দাড়িম্ব রসনার।

কল্যাণী কেলীমুরলী কৃষ্ণকরে বিলাস করছে। মুরলীর দুই প্রান্তে তিন আঙুল পরিমিত স্থান ইন্দ্রনীলমণিতে খচিত, তারপরের তিন আঙুল পরিমিত স্থান দু'দিক থেকেই অরুণমণিতে খচিত, ঠিক মধ্যস্থলটি সোনা দিয়ে মোড়া আর সেই সোনায় আবার হীরে বসানো।

মুরলীকে সম্বোধন করে রাধিকা বলছে, হে মুরলি, তুমি তো জাতিতে সরল, বংশবনে জন্ম বলে তোমার তো কুটিলতা থাকার কথা নয়, আছও তো

-পুরুষোত্তমের হাতে, তবে কার কাছে গোপাঙ্গনাদের বিমোহনের বিষমদীক্ষা নিলে, কোন গুরুর কাছে ?

হে সখি মুরলি, তুমি বিশাল ছিদ্রজালে পূর্ণ, তুমি লঘু, অতি কঠিনা নীরসা গ্রন্থিলা, তবু কোন পুণ্যের ফলে কৃষ্ণকরের আলিঙ্গন ও কৃষ্ণাধরের চুম্বন পাচ্ছ ? আমার কি সেই পুণ্য হয় না ?

হায় কৃষ্ণের বাঁশি ! এই বাঁশির ধ্বনিতে মেঘের গতি স্তম্ভিত হয়, তুম্বুরু ঋষি যে স্বরনাদ-বিশারদ, গায়কশ্রেষ্ঠ, সেও বিস্ময়ে চমকে ওঠে। যারা ব্রহ্মাসক্ত, ব্রহ্মানন্দে মগ্ন, সেই সব সনকসনন্দনের ধ্যান ভেঙে যায়, ব্রহ্মা তার সৃষ্টিকার্য ভোলে, গাম্ভীর্যের প্রতিমূর্তি বলিও চঞ্চল হয় আর অনন্তদেব যে পৃথিবীকে মাথায় ধরে আছে সেও পারে না নির্বিচল থাকতে। সে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ডকটাহ ভেদ করে চলে যায় ঊর্ধ্বলোকে, লোকে-লোকান্তরে।

দেখ কৃষ্ণকে দেখ। তার নয়নচ্ছটায় পুণ্ডরীকের প্রভা তিরস্কৃত, তার পীতাম্বরে নবকুঙ্কুমের শোভা পরাভূত, তার আরণ্য অলঙ্কারে মণিরত্নের আভরণ বিড়ম্বিত। সেই উজ্জ্বলাঙ্গকে, হরিকে দেখ, তার কান্তি হরিণমণিমনোহর। বামজঙ্ঘার অধস্তটে দক্ষিণ চরণটি ন্যস্ত হয়ে দেহের তিনস্থান কিঞ্চিৎ বাঁকা করে রাখা, স্কন্ধ বক্রভাবে স্তম্ভিত, নেত্রপ্রান্ত বক্রভাবে সঞ্চারিত, সঙ্কুচিত অধরে লোলাঙ্গুলিসঙ্গত বাঁশি, নীলকমলের উপর ভ্রমরের মত নয়নের উপরে যার ভ্রূ নৃত্য করছে সেই পরমানন্দ পুরুষকে অঙ্গীকার করো।

বিশ্বকর্মা পাথর কেটে ও ছিদ্র করে শতশত মণিমুক্তা বসিয়ে দেবতাদের গৃহ-চত্বর নির্মাণ করে। এ কে নতুন বিশ্বকর্মা যে তার শাণিত অপাঙ্গের অস্ত্রে গোপতরুণীদের প্রস্তরকঠিন কুলধর্ম চূর্ণ করে নিজের গোষ্ঠস্থল খেলার মাঠ তৈরি করছে !

ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্র কে এই নবীনা যুবা ? স্থিরা পতিব্রতা রমণীদের নীবিবন্ধের অর্গলছেদনের কৌতুকে নিরন্তর এ কার বাঁশি জয়যুক্ত হচ্ছে ?

আর রাধিকা ?

যার নয়নশোভায় নবকুবলয় পরাজিত, যার মুখোল্লাসে ফুল্ল কমলবন উল্লঙ্ঘিত, যার আঙ্গিকরুচিতে স্বর্ণকান্তি লাঞ্ছিত, রাধার সেই অনির্বচনীয় বিচিত্ররূপ ঝলমল করছে।

মধুমঙ্গলকে কৃষ্ণ বলছে, চন্দ্র দিবাতাপে বিরূপ হয়ে যায়, শতপত্র পদ্ম শর্বরীমুখে সন্ধ্যাকালেই ম্লান হয়, আমার প্রেয়সীর স্থিরোজ্জ্বল মুখের সঙ্গে কার তুলনা করব ?

আনন্দরসতরঙ্গে কপোল যার ঈষৎ হাস্যযুক্ত, কন্দর্পধনু, ভ্রূলতা যার নৃত্য করছে, ঘনসন্নিবিষ্ট পক্ষ্মযুক্ত যার চক্ষু, তারই কটাক্ষ আমাকে দংশন করছে।

রামানন্দ বললে, 'তোমার কবিত্ব অমৃতনির্ঝর। এবার তবে দ্বিতীয় নাটক ললিতমাধবের কথা বলো।'

'তুমি সূর্য আর আমি খদ্যোত,' বললে রূপ, 'তোমার কাছে কিছু ব্যাখ্যা-বর্ণনা করা আমার ধৃষ্টতামাত্র।'

'না, না, পড় নান্দীশ্লোক।'

রূপ পড়ল: 'নিশানাথ চন্দ্র রাত আনে আর রাত এলেই চক্রবাকমিথুন বিহারবঞ্চিত হয় আর কমলও বিশীর্ণ হয়ে যায়। তাই চন্দ্র চক্রবাকমিথুন ও কমলের খেদের কারণ। কী রকম চক্রবাক? না, অসুরকামিনীর স্তন। আর কী রকম কমল? না, অসুরকামিনীর মুখ। কৃষ্ণযশঃশশীও অসুরকামিনীর স্তনযুগরূপ চক্রবাকমিথুনের ও মুখরূপ কমলের খেদ উৎপাদন করে। যেহেতু কৃষ্ণ তাদের স্বামীদের বধ করেছেন, স্তনে পতিকরস্পর্শের অভাব ও মুখে পতির অধর-স্পর্শের অভাব থেকেই খেদ। কিন্তু চন্দ্রে উল্লাসও তো আছে। উল্লাস চকোরের। চকোর চন্দ্রের সুধাপান করে বলে চন্দ্রোদয়ে তার অসীম আনন্দ। তেমনি কৃষ্ণের দর্শনে, কৃষ্ণের লীলাকথা শ্রবণে সুহৃদ ও ভক্তদের আনন্দ। তাই কৃষ্ণের যশঃশশী অখিল সুহৃচ্চকোরনন্দা।'

'তারপরে দ্বিতীয় নান্দী বলো।' রামানন্দ বললে, 'যাতে ইষ্টদেবের চরণ-বন্দনা।'

আবার সঙ্কুচিত হল রূপ। তবু পড়ল থেমে-থেমে: 'যিনি ক্ষিতিতলে উদিত হয়ে স্বীয় প্রেমসুধা অকাতরে বিতরণ করছেন, যিনি দ্বিজকুলের অধিরাজ, যিনি অজ্ঞানতিমির নাশ করেছেন, যিনি বশীকৃতজগন্মনা, জগজ্জনের মন যাঁর বশীভূত, সেই শচীসুতশশী দিকে-দিকে আনন্দ চালুন।'

অন্তরে উল্লসিত হলেও বাইরে কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করলেন প্রভু: 'কৃষ্ণরস-কাব্যসুধাসিন্ধুর মধ্যে আমার মিথ্যাস্তুতির ক্ষারবিন্দু মিশিয়েছ কেন? তাতে অমৃতের স্বাদ নষ্ট হয়ে গেল।'

রামানন্দ বললে, 'অমৃতের সঙ্গে কর্পূর মিশল। তাতে আনন্দ-চমৎকারিতা আরো বেড়ে গেল।'

'তোমার এতে উল্লাস হচ্ছে? শুনতে লজ্জা করে, লোকে উপহাস করবে।'

'এ শুনে লোকের আনন্দ বাড়বে।' বললে রামানন্দ, 'অভীষ্টদেবের স্তুতি

চিরজাগরূক থাকবে।' তাকাল রূপের দিকে : 'ললিতমাধবের কী বিষয়বস্তু ?'

'কৃষ্ণ কিরাতরাজ কংসকে নিধন করবে ও রাধাকে বিবাহ করবে।' বললে রূপ, 'সমৃদ্ধিমান সম্ভোগের পুষ্টির জন্যে রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহের প্রয়োজন।'

বংশীধ্বনির গুণকীর্তন শুনুন।

যে দূতী নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটিয়ে দেয় তাকে নিসৃষ্টার্থা দূতী বলে। বয়-বংশজকাকলী অর্থাৎ বংশীধ্বনি সেই নিসৃষ্টার্থা দূতী। রাধিকার কানের মধ্যে দিয়ে মর্মে পৌঁছে তাকে বিলজ্জা করে কৃষ্ণের কাছে টেনে নিয়ে আসে। রজ আর তম দুই-ই কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন ঘটায় বৃন্দাবনে। রজ মানে গো-ধূলি আর তম মানে সন্ধ্যার অন্ধকার। সাধারণত রজ আর তমগুণে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় না। কিন্তু বৃন্দাবনে বিপরীত। এখানে রজ আর তমই কৃষ্ণমিলনের সহায়ক। তাই ব্রজাঙ্গনার ভজনকৌশল বেদেরও অপ্রকট।

হে সহচরি, যে নবজলধরকান্তি, মদমত্ত মাতঙ্গের মত যার বিলাস, সেই নির্ভীক নিরাতঙ্ক যুবক কে ? কোথা থেকে এসেছে ব্রজমণ্ডলে ? হায়, তার কটাক্ষদস্যু আমার চিত্তধনাগার থেকে ধৈর্যধন লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে।

আর কৃষ্ণ বলছে রাধিকার উদ্দেশে : 'যে আমার চিত্তকরীন্দ্রের বিহার-মন্দাকিনী, যে আমার নয়ন-চকোরের শারদীয় চন্দ্রপ্রভা, যে আমার হৃদয়াকাশের চারুতারাবলী, বহুকালব্যাপী উৎকণ্ঠার ফলে তাকে আমি পেয়েছি।'

রামানন্দ সহস্র মুখে রূপের কবিত্বের প্রশংসা করতে লাগল। সেই কবির কাব্যরচনায় প্রয়োজন কী যদি তা অন্যের হৃদয়ে লগ্ন হয়ে আনন্দে না তাকে অভিভূত করে ? সেই ধনুর্ধারীর বাণনিক্ষেপেই বা কী প্রয়োজন যদি তা অন্যের হৃদয়ে লগ্ন হয়ে তার মূর্ছা না ঘটায় ?

প্রভুকে উদ্দেশ করে বললে, 'তোমার শক্তিতেই এই কাব্যসৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।'

'প্রয়াগে এর সঙ্গে দেখা। এর বড় ভাই সনাতন,' বললেন প্রভু, 'তারও বিষয়ত্যাগ তোমার মতই। এই দু'ভাইকে আমি বৃন্দাবনে পাঠালাম, ভক্তিশাস্ত্র প্রবর্তন করবার জন্যে শক্তিসঞ্চার করে দিলাম। দেখ গ্রন্থ কেমন মধুর, প্রসন্ন ও সালঙ্কার হয়েছে। কবিত্ব থাকলেই তো রসপ্রচার হবে।'

'সব তোমার ইচ্ছায়।' বললে রামানন্দ, 'তুমি ইচ্ছে করলে কাঠের পুতুল নাচাতে পারো। গোদাবরীতীরে আমার মুখে যে-সব রসতত্ত্ব বলালে সব আবার এই রূপের লেখায় স্থাপিত হয়েছে। ভক্তের প্রতি কৃপায় ব্রজরস প্রচার করতে চাও, যাকে দিয়ে তুমি করাবে সেই করবে, সমস্ত জগৎ তোমার বশংবদ।'

রূপকে প্রভু আলিঙ্গন করলেন। আর রূপকে দিয়ে সকল ভক্তের চরণবন্দনা করালেন। সকলে চলে গেলে হরিদাস একান্তে এসে আলিঙ্গন করল রূপকে। বললে, 'তোমার কি ভাগ্য, কে বলবে তোমার রচনার কী মহিমা।'

'আমি কিছুই জানি না। প্রভু যেমন বলিয়েছেন তেমনি বলেছি।'

প্রভুর ভক্ত গৌড়ীয়েরা চার মাস থেকে গৌড়ে ফিরল। রূপ থেকে গেল নীলাচলে। দোলযাত্রার পরে প্রভু রূপকে বৃন্দাবনে যেতে বললেন। বললেন, 'তুমি সেখানে থাকো, একবার সনাতনকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।'

রূপ প্রভুকে প্রণাম করে বৃন্দাবনে যাবার উদ্দেশে গৌড়ে এল।

॥ ৬৫ ॥

'সর্বলোক নিস্তারিতে গৌর-অবতার।' নিস্তার কী? মায়া-মোহের বন্ধন মোচন। সংসারসাগর থেকে পার করে দেওয়া।

তিন উপায়ে এই জীবোদ্ধার। সাক্ষাৎ দর্শন, আবেশ আর আবির্ভাব।

সাক্ষাৎ-দর্শন মানে প্রভুকে যারা দেখেছে স্বচক্ষে। কখনো কেউ সামনে এসে দেখেছে, কখনো কেউ, প্রভু যখন যাচ্ছেন পথ দিয়ে, দেখেছে দূরে দাঁড়িয়ে। দেখামাত্রই মায়ামুক্তি। দেখামাত্রই হৃদয়-গ্রন্থির ছেদ, সর্বসংশয়ের শান্তি, সমস্ত কর্মের নিরসন।

আর আবেশ? আবেশ মানে প্রভুর ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে থাকা। প্রভু ছাড়া আর সমস্ত কিছুর বিস্মৃতি। এমন কি নিজে যে বদ্ধজীব তারও বিস্মৃতি। লোহা আগুনে পুড়ে লাল হয়ে উঠেছে, ভুলে যাচ্ছে সে লোহা, ভাবছে সেও আগুন ছাড়া কিছু নয়।

আবেশ সকলের হয় না। যে যোগ্য তার হয়। যোগ্য কে? যে শুদ্ধসত্ত্ব যে সাধু তার হয়। সাধু কে? যে তিতিক্ষু, কারুণিক, সর্বদেহীর সুহৃদ, অজাতশত্রু, শান্ত, অক্রোধ ও সমচিত্ত সেই সাধু।

আর আবির্ভাব? সমস্ত লোকনিয়ম অগ্রাহ্য করে আত্মপ্রকাশের নামই আবির্ভাব। লৌকিক উপায় ছাড়াই হঠাৎ এসে উপস্থিত।

'লোক নিস্তারিব—এই ঈশ্বরস্বভাব।'

কৃপাই ঈশ্বরধর্ম। তবে জীবের কেন এত দুর্দশা? দুর্দশার জন্যে দায়ী ঈশ্বর

নয়, দায়ী জীব নিজে। ভগবান তো লীলানন্দেই সৃষ্টি করেছিলেন, কাউকে শাস্তি দেবার জন্তে নয়। জীবই নিজ কর্মদোষে যন্ত্রণা ভোগ করছে।

বাঙলা দেশের লোক প্রতি বছর এসে দেখে যাচ্ছে প্রভুকে। কুড়ি বছর এই-রকম যাতায়াত করেছে। নীলাচলে প্রভুর চব্বিশ বছরের মধ্যে কুড়ি বছর। চার বছর তারা আসে নি। চার বছরের মধ্যে দু'বছর প্রভু দক্ষিণ-ভ্রমণে ছিলেন, এক বছর এসেছিলেন গৌড়ে আর এক বছর তিনি নিজেই বারণ করে দিয়েছিলেন আসতে। এই চার বছর। বাকি কুড়ি বছর তারা এসে গেছে।

'বিংশতি বৎসর ঐছে করে গতাগতি।
অন্যোন্যে দোঁহার দোঁহা বিনা নাহি স্থিতি॥'

অন্যান্য দেশ থেকেও আসছে জনপ্রবাহ। এমন কি মনুষ্যবেশ ধরে গন্ধর্ব কিন্নররাও আসছে। দেবতারাও সুযোগ ছাড়তে রাজি নয়। আর যেই দেখছে সেই 'বৈষ্ণব' হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু যারা আসতে পারছে না, যারা সংসারাবদ্ধ, যারা বিত্তবৃত্তে আসক্ত, তাদের কী হবে? তারা উদ্ধার পাবে না? তাদের জন্তে প্রভু যোগ্য দেহে আবেশ এনে দিচ্ছেন। সেই আবেশেই নিজ শক্তি প্রকাশ করছেন। আর সেই আবিষ্ট ভক্তকে দেখে সেই দেশের লোক উদ্ধার হয়ে যাচ্ছে।

কালনার কাছে অধিকায় নকুল ব্রহ্মচারীর বাড়ি। উত্তম অধিকারী, পরম বৈষ্ণব। তার দেহে প্রভুর আবেশ হল। গ্রহগ্রস্তের মত হয়ে গেল নকুল। প্রেমাবেশে হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়, ধুলোয় গড়াগড়ি দেয়। সাত্ত্বিক বিকার, অশ্রু কম্প স্তম্ভ যেন সমস্ত ফুটে উঠেছে। হুঙ্কার ছাড়ছে সঘনে। ঠিক প্রভুর মতই গৌরকান্তি, প্রভুর মতই প্রেমানন্দ। সমস্ত গৌড়দেশ ভেঙে পড়ল নকুলকে দেখতে। যাকে দেখে তাকেই বলে, কৃষ্ণনাম বলো। যে দেখে সেই প্রেমোন্মাদ হয়ে ওঠে। লোকাপেক্ষা মানে না।

শিবানন্দ সেনের সন্দেহ হল। দেখি পরীক্ষা করে। দেখি কেমন প্রভুর আবেশ হয়েছে!

নকুলের বাড়ি গেল শিবানন্দ। ভিতরে ঢুকল না, বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল। কী ভাবে পরীক্ষা করবে ভাবতে লাগল।

বেশ, আমি যে এসেছি তা নকুল জানে না, দেখে নি। আমাকে নাম ধরে ডাকুক তো দেখি। না, শুধু ওটুকু হবে না। গুরু আমাকে যে ইষ্টমন্ত্র দিয়েছিলেন তাও প্রকাশ করুক। সে যদি এখন সত্যিই প্রভু হয়ে গিয়ে থাকে তা হলে

নিশ্চয়ই তার পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব হবে, যেহেতু প্রভু সর্বজ্ঞের শিরোমণি। আমার ইষ্টমন্ত্র যদি প্রভুর অজানা না হয়, আবেশধারী নকুলেরও অজানা থাকবে না।

এই বিচার করে শিবানন্দ দূরে রইল প্রচ্ছন্ন হয়ে।

বহু লোকের ভিড় হয়েছে নকুলকে দেখতে, কে শিবানন্দের খোঁজ নেয়।

হঠাৎ নকুল বলে উঠল: 'শিবানন্দ এসেছে। দূরে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ গিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে এস।'

কোথায় শিবানন্দ? চারদিকে লোক ছোটাছুটি করতে লাগল।

শিবানন্দ কে? কারু কারু মুখে বা এই জিজ্ঞাসা।

আরে, এই তো শিবানন্দ। যারা চিনতো ধরে ফেলল।

নকুলকে নমস্কার করে কাছে গিয়ে বসল শিবানন্দ। নকুল বললে, 'আমার সম্পর্কে তোমার সন্দেহ হয়েছে, তাই না? বেশ, আমি তোমার সন্দেহ দূর করে দিচ্ছি। তোমার ইষ্টমন্ত্র কী, তাই আমার মুখে শুনতে চাও তো? গৌর-গোপালই তোমার ইষ্টমন্ত্র। কী, ঠিক নয়?'

শিবানন্দ মেনে নিল। ঠিক বলেছ। আর সন্দেহ নেই, তোমাতেই প্রভুর আবেশ হয়েছে। শিবানন্দ তখন অনেক সম্মান-ভক্তি দেখাল নকুলকে।

আবির্ভাব দু'রকম। নিত্য আর সাময়িক। প্রভুর নিত্য আবির্ভাব চার জায়গায়। শচীর মন্দিরে, নিত্যানন্দ-নর্তনে, শ্রীবাস-কীর্তনে আর রাঘব-ভবনে।

প্রেমাকৃষ্ট হওয়াই প্রভুর সহজ স্বভাব। শচীমাতা নিত্যানন্দ শ্রীবাস আর রাঘব প্রভুর সহজ প্রেমস্থল, তাঁর নিত্যনিকেতন।

আর সাময়িক?

শিবানন্দের ভাগ্নে শ্রীকান্ত। একবার রথযাত্রার আগে একাকী নীলাচলে গিয়েছিল। প্রভু তাকে বললেন, 'এবার যেন রথযাত্রার আগে কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে না আসে, গৌড়ে ফিরে গিয়ে এ-কথা বোলো সবাইকে। আমিই এবার গৌড়ে গিয়ে সকলকে দেখা দিয়ে আসব। আর তোমার মামা শিবানন্দকে বোলো এই পৌষে হঠাৎ একদিন তার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হব, আর জগদানন্দ সেখানে আছে, সে আমার জন্যে রান্না করবে।'

গৌড়ে ফিরে এসে খবর দিল শ্রীকান্ত। সকলে যাত্রার আয়োজন বন্ধ করল। পৌষ মাস এলে শিবানন্দ আর জগদানন্দ প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে রইল কবে না

জানি প্রভু উদয় হন। দিনের পর দিন যায়, মাসও বুঝি ফুরিয়ে গেল, প্রভুর দেখা নেই। দুঃখে-শোকে ম্লান হয়ে গেল দু'জনে। এমন সময় হঠাৎ একদিন প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী—প্রভু তার নাম রেখেছেন নৃসিংহানন্দ—শিবানন্দের বাড়িতে এসে হাজির। কী ব্যাপার, বিমর্ষমুখে বসে আছ কেন ?

শুনল সব নৃসিংহ। বললে, 'বেশ, ঠিক আছে, তিন দিনের মধ্যে প্রভুকে এখানে নিয়ে আসব।'

প্রদ্যুম্ন ধ্যানস্থ হল। দু'দিন পরে বললে, 'প্রভু পানিহাটি পর্যন্ত এসেছেন। কাল মধ্যাহ্নে এখানে চলে আসবেন। রান্নার জোগাড় করো।'

পরদিন ভোর থেকে রাঁধতে শুরু করল প্রদ্যুম্ন। রান্না শেষ করে মধ্যাহ্নে ভোগ বাড়ল—তিন থালায় তিন ভোগ। এক ভোগ জগন্নাথের, আরেক ভোগ চৈতন্যপ্রভুর আর তৃতীয় ভোগ প্রদ্যুম্নের ইষ্টদেব নৃসিংহের। তিন জনকে তিন থালা সমর্পণ করে প্রদ্যুম্ন আবার ধ্যানে বসল। প্রদ্যুম্ন দেখল প্রভু এসেছেন। এসে শুধু তাঁর নিজের থালারই নয়, আরো দুই থালার ভোগও নিঃশেষে খেয়ে ফেললেন।

'কী করো কী করো! চোখে অশ্রু, কণ্ঠে আনন্দ, চেঁচিয়ে উঠল প্রদ্যুম্ন: 'জগন্নাথের ভোগ খাচ্ছ তো খাও, তোমাতে জগন্নাথে ভেদ নেই, কিন্তু তুমি আমার নৃসিংহ ঠাকুরের ভোগ খাও কী করে? হায় হায়, আমার ঠাকুর আজ উপোসী রইল। ঠাকুরকে উপবাসী রেখে আমি বাঁচব কী করে?'

মুখে এ কথা বললে বটে কিন্তু প্রভু নৃসিংহের ভোগও গ্রহণ করেছেন দেখে মনে অগাধ শান্তি পেল প্রদ্যুম্ন। তা'হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সঙ্গে জগন্নাথের যেমন ভেদ নেই তেমনি নৃসিংহেরও কোনো ভেদ নেই। এ-সম্পর্কে প্রদ্যুম্নের মনে বুঝি কোনো সন্দেহ ছিল, প্রভু নিজে এসে তা খণ্ডন করে দিলেন।

পরিপাটি ভোজন করে প্রভু পানিহাটি চলে গেলেন।

'এ কি, তুমি তখন চেঁচিয়ে উঠলে কেন?' শিবানন্দ তো কিছু দেখতে পায় নি, তাই সে অবাক হয়ে প্রশ্ন করল প্রদ্যুম্নকে।

'বা, প্রভু যে একাই তিন ভোগ খেয়ে গেলেন,' বললে প্রদ্যুম্ন, 'আমার নৃসিংহ যে অনাহারে রইল।'

এ কী বলছে অসম্ভব কথা! দেখলাম না শুনলাম না, অথচ ফুরিয়ে গেল? এ কি স্বপ্ন না আবেশ না সত্য?

প্রদ্যুম্নের আদেশে শিবানন্দ আবার রান্নার জোগাড় করলে। আমার

70288 15/4/80 AGARTALA TRIPURA

উপাস্তকে এবার খাওয়াই, একলা খাওয়াই। সেবার নিয়ম-নিষ্ঠা বজায় রাখি।

পরের বছর শিবানন্দ এসেছে নীলাচল। প্রভু নৃসিংহানন্দের কথা তুললেন, তার গুণের কথা বললেন, গত পৌষ মাসে শিবানন্দের বাড়িতে কী চমৎকার রান্না করে আমাকে খাওয়ালে! এমন অন্নব্যঞ্জন খাই নি কোনো দিন।

তবে শিবানন্দের বিশ্বাস হল।

ভগবান আচার্য শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, সরল বৈষ্ণব। বাবা শতানন্দ খান ঘোর বিষয়ী কিন্তু ভগবান আচার্য বিষয়-বিমুখ বৈরাগ্যপ্রধান। সখ্যভাবে সমাসীন। 'সখ্যভাবাক্রান্তচিত্ত।' ছোট ভাই গোপাল কাশীতে বেদান্ত পড়ে, তার কাছে এসেছেন নীলাচলে, ভগবান তাকে প্রভুর কাছে নিয়ে গেল। গোপালকে দেখে প্রভু অন্তরে খুশি হলেন না। কৃষ্ণভক্তি ছাড়া কিছুতেই প্রভুর উল্লাস নেই, কিন্তু শঙ্কর-ভাষ্য পড়ে গোপাল তো জীবে-ব্রহ্মে এক করেছে, কৃষ্ণভক্তির বাষ্প পর্যন্ত তাতে নেই। তবু ভগবানের ভাই সেই খাতিরে বাইরে প্রীতির ভাবটুকু বজায় রাখলেন।

ভগবান স্বরূপ গোঁসাইকে বললে, 'গোপাল বেদান্ত শিখে এসেছে। এস এক-দিন আমরা সবাই ওর ব্যাখ্যা শুনি।'

'তার মানে? তোমারও শঙ্কর-ভাষ্যে প্রীতি জন্মেছে নাকি? শঙ্কর-ভাষ্য তো ভক্তির প্রতিকূল, তবে তোমার ওতে আগ্রহ কেন?' স্বরূপদামোদর রেগে উঠল: 'গোপালের সঙ্গে-সঙ্গে তোমারও বুদ্ধিভ্রংশ হল নাকি? বৈষ্ণব যদি শঙ্কর-ভাষ্য শোনে তা হলে তার সেব্য-সেবক ভাব দূর হয়ে যেতে পারে, নিজেকেই ভাবতে পারে ঈশ্বর বলে। তখন তার সমস্ত বৈষ্ণবত্বই মাটি।'

ভগবান বললে, 'আমরা কৃষ্ণনিষ্ঠ। কোনো ভাষ্যের সাধ্য নেই আমাদের মন ফেরায়।'

'তবু মায়াবাদ শুনে কোনো লাভ নেই।' বললে স্বরূপদামোদর, 'ঐ ভাষ্যে একবারও কৃষ্ণনাম শোনা যায় না, শোনা যায় কেবল চিৎ ব্রহ্ম মায়া মিথ্যা এই সব শব্দ। শঙ্কর-ভাষ্য বলছে যারা সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের কল্পনা করেছে তারা অজ্ঞ ও অজ্ঞান। এ-সব কথা শুনলে ভক্তের বুক ফেটে যায়।'

ঘোরতর লজ্জা পেল ভগবান। হয়তো বা প্রভুর কৃপা হতে বঞ্চিত হবে সেই ভয়ও ঢুকল। গোপালকে তক্ষুনি পাঠিয়ে দিল দেশে।

এ দিন ভগবান প্রভুকে নিজ গৃহে খাওয়াবে বলে নিমন্ত্রণ করেছে। কিন্তু ঘরে ভালো চাল নেই। প্রভুর কীর্তনিয়া ছোট হরিদাসকে ডেকে বললে, 'শিখি

মাহাতীর বোন মাধবী দেবীকে চেন? প্রভুর মতে রাধিকা-সেবার সাড়ে তিন-জন মাত্র অধিকারী আছেন জগতে—এক স্বরূপদামোদর, দুই রায় রামানন্দ, তিন শিখি মাহাতী আর আধ মাধবী। মাধবী স্ত্রীলোক বলে অর্ধ। চেন তো সেই মাধবীকে?'

'সেই বৃদ্ধাতপস্বিনী বৈষ্ণবীকে চিনি না? খুব চিনি।' বললে ছোট হরিদাস, 'কী করতে হবে তাই বলুন।'

"তার বাড়ি থেকে কিছু ভালো চাল নিয়ে এস।'

মাধবী দেবীর কাছ থেকে ভালো চাল নিয়ে এল ছোট হরিদাস।

মধ্যাহ্নে প্রভু খেতে এলেন। সরু শালি ধানের চাল দেখে ভগবানকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এমন ভালো চাল তুমি কোথায় পেলে?'

ভগবান বললে, 'মাধবী দেবীর কাছ থেকে চেয়ে এনেছি।'

'কে গিয়ে চেয়ে নিয়ে এসেছে?'

'ছোট হরিদাস।'

ভোজনান্তে নিজের ঘরে ফিরে প্রভু সেবক গোবিন্দকে বললে, 'তোমাকে একটা কথা বলে রাখছি, আজ থেকে ছোট হরিদাসকে আমার এখানে আসতে দেবে না।'

ছোট হরিদাসের ঘার মানা হয়ে গেল। কেন হল কে জানে। ছোট হরিদাস তো পথে বসল। কী অপরাধ করলাম তা কে জানে। আহার ত্যাগ করে কাঁদতে লাগল নির্জনে।

স্বরূপদামোদর জানতে চাইল কী কারণ। তিন দিন ধরে উপবাসী রয়েছে। কী অপরাধে তার এমন গুরুদণ্ড হল?

'ও বৈরাগী হয়ে স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলেছে,' বললেন প্রভু, 'তাই ওর এই শাস্তি। যে বৈরাগী হয়ে প্রকৃতি-সম্ভাষণ করে আমি তার মুখদর্শন করি না। ইন্দ্রিয় দুর্বার, কাঠের স্ত্রীমূর্তি দেখেও মুনিদের মন টলে। বাহ্য বৈরাগ্যে, মর্কট বৈরাগ্যে কোনো ফল নেই। স্ত্রীসম্ভাষণের অপরাধের জন্য আমাকে কঠোর শাসন রাখতেই হবে।'

আর কিছু বলতে কারু সাহস হল না, সবাই চুপ করে গেল।

কিন্তু আবার একদিন গেল প্রভুর কাছে। মিনতি করে বললে, 'এবারের মত মার্জনা করুন। ওর অপরাধ সামান্য।'

'না, প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগীর মুখ আমি দেখি না।' প্রভু বললেন, 'বৃথা কথা

ছাড়ো, নিজ-নিজ কাজ করো গে। আর যদি এ বিষয়ে কিছু বলো, আমি অন্যত্র চলে যাব।'

তখন সবাই গিয়ে পরমানন্দ পুরীকে ধরল।

'প্রভুকে প্রসন্ন করুন।'

পরমানন্দ একা-একা প্রভুর কাছে এসে দাঁড়াল।

'কী চাই? কেন এসেছ?' জিগগেস করলেন প্রভু।

'ছোট হরিদাসের প্রতি প্রসন্ন হোন।'

তোমরা বৈষ্ণবেরা সব এখানে থাকো, আমি আলালনাথে চললাম।' বলে ডাকলেন গোবিন্দকে: 'চলো, এখানকার পাট তুলে ফেল।'

অনেক অনুনয় করে পরমানন্দ প্রভুকে ঘরে এনে বসাল। বললে, 'তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর। তুমি যা খুশি করতে পারো, তোমার কথার উপরে আর কারু কথা চলে না। তোমার যা কিছু করা সমস্তই লোকহিতের জন্যে, তোমার গূঢ় অভিপ্রায় আমরা কী করে বুঝব বলো। তুমি এখানেই থাকো, আমরা আর কিছু বলতে আসব না।'

তখন তারা সকলে ছোট হরিদাসের কাছে গেল।

বললে, 'দয়াময় প্রভু নিশ্চয়ই কৃপা করবেন। এখন ক্রুদ্ধ আছেন কিন্তু এই ক্রোধ তাঁর চলে যাবে। তুমি যদি জেদ করে উপবাস চালাও প্রভুর জেদ বাড়বে। তুমি স্নানাহার করো, তা হলেই প্রভু শান্ত হবেন।'

ছোট হরিদাস আশ্বস্ত হয়ে স্নানাহার করল। কিন্তু কই প্রভু তাকে ডাকছেন কোথায়?

প্রভু যখন জগন্নাথদর্শনে যান তখন ছোট হরিদাস দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। আগে কত কাছাকাছি বিচরণ করত, কত গান শোনাত, নাচত পায়ে-পায়ে। কত চরণস্পর্শ পেত, কত নেত্রামৃতস্পর্শ। আজ সে পরিত্যক্ত, প্রত্যাখ্যাত।

উপায় নেই। লোক-শিক্ষার জন্যেই প্রভুর এই ভক্তবর্জন। এক ভক্তকে শাসন করে বহু ভক্তকে শিক্ষা দিচ্ছেন।

'প্রিয় ভক্তে দণ্ড করে ধর্ম বুঝাইতে।'

সকলের ত্রাস উপস্থিত হল। স্বপ্নেও আর কেউ স্ত্রী-সম্ভাষণ করে না।

এক বছর কেটে গেল তবু ছোট হরিদাস পেল না প্রভুর করুণা। একটিবারও তিনি ডেকে পাঠালেন না, পথে যদি পড়ে যায় তবুও তিনি তাকে এড়িয়ে চলে যান, ভ্রূক্ষেপও করেন না।

ছোট হরিদাসের জীবনে ধিক্কার এসে গেল। প্রভুর উদ্দেশে প্রণাম করে একদিন রাত্রিশেষে একা-একা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। চলল প্রয়াগের দিকে। প্রভুপদ প্রাপ্তির সঙ্কল্প করে ত্রিবেণীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল।

মরদেহ ছেড়ে দিল। ধরল দিব্যদেহ। দিব্যদেহে চলে এল প্রভুর কাছে। কোথায় আর দ্বার-মানা? কে আর পথরোধ করে?

সে কী, কে গান গাইছে? কৃষ্ণগান না? হ্যাঁ, কৃষ্ণগানই তো। প্রভুকে শোনাবার জন্যেই এই গান। দেহ ছেড়ে দিলেও তোমার সেবা করা ছাড়ি নি।

প্রভু বলে উঠলেন, 'ছোট হরিদাস কোথায়?' করুণার্দ্র তাঁর কণ্ঠ: 'তাকে এখানে কেউ ডেকে আনো।'

সবাই বললে, 'কোথায় চলে গিয়েছে কেউ বলতে পারে না।'

শুনে প্রভু ঈষৎ হাসলেন। তাকে যে আমার কাছেই ডেকে এনেছি, সে যে আমাকে কীর্তন গেয়ে শোনাচ্ছে এ তোমরা কী করে জানবে? চলে গিয়েছে বৈকি। কোথায় চলে যাবে?

একদিন সবাই সমুদ্রে স্নান করতে গেছে, জগদানন্দ, স্বরূপ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর, দামোদর, শঙ্কর আর মুকুন্দ—শুনতে পেল দূরে ছোট হরিদাস গান করছে। হুবহু সেই গলা, সেই পদ। কী আশ্চর্য, লোক নেই, শূন্যে গান হচ্ছে!

গোবিন্দ বললে, 'ছোট হরিদাস নিশ্চয়ই বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। তাই সে এখন ব্রহ্মরাক্ষস হয়েছে। নিরাকারে গান ধরেছে।'

'এ হতে পারে না।' বললে স্বরূপ, 'আজীবন কৃষ্ণকীর্তন করেছে, প্রভুর সেবা করেছে। যে প্রভুর কৃপাপাত্রি তার এমন দুর্গতি সম্ভব নয়।'

প্রয়াগ থেকে এক বৈষ্ণব নবদ্বীপে এসে ছোট হরিদাসের কথা বললে সবাইকে। শ্রীবাস ও অন্যান্য সকলেই বিমূঢ় হয়ে গেল। যথারীতি সবাই যখন গিয়েছে নীলাচলে শ্রীবাস জিজ্ঞেস করলে প্রভুকে, 'আমাদের ছোট হরিদাস কই?'

প্রভু বললেন,'স্বকর্মফলভুক পুমান। যে যেমন কর্ম করে সে তেমনি ফলভোগ করে।'

'শুনেছি সে ত্রিবেণীতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে।'

'প্রকৃতি দর্শন করলে এই প্রায়শ্চিত্ত।' বললেন প্রভু, 'কিন্তু দিব্যদেহে এখন সে আমাকে কীর্তন শোনাচ্ছে।'

ত্রিবেণী-প্রভাবেই ছোট হরিদাস প্রভুপদ লাভ করল।

এক লীলায় কত কাজ করলেন প্রভু। দেখালেন কারুণ্য, প্রকট করলেন

ভক্তের গাঢ়ানুরাগ, প্রতিষ্ঠিত করলেন তীর্থের মহিমা। দিলেন বৈরাগ্যশিক্ষা। সর্বোপরি দেহত্যাগের পরেও ভক্তকে আপনার বলে অঙ্গীকার করলেন। তাকে দিলেন দিব্যদেহে সেবাধিকার। তুমি আমাকে বিরতিবিহীন কৃষ্ণকীর্তন শোনাও।

সাধু ভক্তির অনুষ্ঠান করবে তাতে বাহাদুরি কী, যে দুরাচার সে-ও যদি অনন্যভাব হয়ে আমাকে ভজনা করে, বলছেন শ্রীকৃষ্ণ, তা'হলে তাকেও সাধু বলে মনে করবে। কারণ সে আমাকেই শ্রেষ্ঠনিশ্চয় বলে আশ্রয় করেছে। আর চিত্রকেতু তো স্বর্গগত অবস্থায় ভজন করেছিল। ছোট হরিদাস করবে অশরীরী অবস্থায়। স্থলে-জলে-অন্তরীক্ষে সর্বত্র আমি কীর্তন শুনব।

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবালকদের বলছেন, প্রাণ অর্থ বুদ্ধি ও বাক্য দিয়ে জীবের যে মঙ্গলাচরণ তাই এ জগতে মনুষ্যজন্মের সফলতা। যা ইহকালে ও পরকালে প্রাণীদের উপকারের নিমিত্তভূত হয়, কর্ম, মন ও বাক্য দিয়ে তাই করবে। সর্বপ্রাণীর উপজীব্য বৃক্ষের জন্মই সর্বশ্রেষ্ঠ। সুজনের কাছে প্রার্থী কখনো ব্যর্থ হয় না, বৃক্ষের কাছেও বিমুখ হয় না যাচক। ফল না পায় ছায়া তো অন্তত পাবে!

'মালী হৈয়া বৃক্ষ হইলাঙ এই ত' ইচ্ছাতে।
সর্বপ্রাণীর উপকার হয় বৃক্ষ হৈতে॥'

আর এ বৃক্ষের ফল তো অবধারিত। এ ফলের নাম প্রেমফল। এ মহামাদক। এত মাদক যে একা খাওয়া যায় না, সবাইকে ডেকে এনে খেতে হয়, খাওয়াতে হয়। এ ফল খেলেই অজর-অমর।

'একলা মালাকার আমি কত ফল খাব?
না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব॥'

॥ ৬৬ ॥

একটি ব্রাহ্মণকুমার প্রত্যহ আসে প্রভুর কাছে। প্রভুকে ভীষণ ভালোবাসে, প্রভুও তার প্রতি করুণ কোমল স্নেহশীল।

কিন্তু এই মেশামেশি দামোদরের কাছে অসহ্য।

'তুমি রোজ আস কেন?' বালককে দামোদর শাসন করতে চায়।

'প্রভুকে যে আমার খুব ভালো লাগে।'

'তা লাগুক। তবু তুমি আসবে না।' কঠোরকণ্ঠে দামোদর বললে।

'বা, যাকে ভালো লাগে তার কাছে আসব না?' বালক গ্রাহ্য করল না: 'প্রভুও যে আমাকে খুব ভালোবাসেন, আসতে বলেন। না এলে তাই পারি না থাকতে।'

'না, আসবে না।' দামোদর রুদ্র হয়ে উঠল।

বয়ে গেছে! বালক তা গায়েও মাখে না। পরদিন আবার আসে। এসে বসে প্রভুর পাশটিতে।

'চমৎকার!' বালক চলে গেলে দামোদর প্রভুকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল: 'অন্যকে উপদেশ দিতে তুমি খুব ওস্তাদ, নিজের বেলায় খোঁজ নেই। বেশ, বেরোবে এবার গোঁসাইগিরি, নীলাচলে আর কান পাতা যাবে না।'

'কী হয়েছে? কী বলছ তুমি?' সরল মনে জিজ্ঞেস করলেন প্রভু।

'তোমার কী! তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তুমি যা খুশি করতে পারো, তোমাকে কে বাধা দেবে?' দামোদর আহতকণ্ঠে বললে, 'কিন্তু তুমি লোকের মুখ চাপা দেবে কী করে? তুমি তো পণ্ডিতের শিরোমণি, নিজেই বিচার করে দেখ না তোমার এ আচরণ ঠিক হচ্ছে?'

'কেন, কী হল?'

'কেন, তুমি জানো না ঐ ব্রাহ্মণ বালকের মা বিধবা ও সুন্দরী?' দামোদরের স্বরে ঘোর বিরক্তি: 'হতে পারে, হ্যাঁ স্বীকার করি, সে সতীসাধ্বী তপস্বিনী। কিন্তু তার প্রধান দোষ সে যুবতী। আর তুমিও যুবক, পরমসুন্দর। এ নিয়ে কানাঘুষো শুরু হবে, এক কথা থেকে নানা কথা। লোককে তুমি কেন কথা বলার অবকাশ দেবে?'

কী শুদ্ধ প্রীতি দামোদরের! দামোদরের মত অন্তরঙ্গ আর হতে নেই। প্রেমে বাক্যদণ্ড দিতে পেছপা হল না। যে সত্যি-সত্যি ভক্ত সে যে তার প্রভুকেও শাসন করতে পারে তাই দেখাল দামোদর। একেই বলে নিরপেক্ষতা।

অন্তরে প্রগাঢ় সন্তোষ, প্রভু হাসলেন।

একদিন নিভৃতে ডাকলেন দামোদরকে। বললেন, 'দামোদর, তুমি নবদ্বীপে যাও। আমার মার কাছে গিয়ে থাকো। সেখানে থেকে সকলের অন্যায় আচরণ শাসন করো।'

দামোদর চুপ করে রইল।

'তুমি যখন আমার ত্রুটির জন্যে আমাকেই দণ্ড দিতে পারো, তুমি আর-সকল

অপরাধীকেও সহজেই শাসন করতে পারবে। তোমার মত উচিতবক্তা আর কাউকে দেখি না।' বললেন প্রভু, 'তুমিই নিরপেক্ষ, আর কে না জানে, নিরপেক্ষ না হলে ধর্মরক্ষা অসম্ভব।'

দামোদর কথা বলল না।

'তুমি আমার মায়ের কাছে গিয়ে থাকো, আর তাঁকে বোলো আমি সুখে আছি। আমি সুখে আছি শুনলেই মা সুখী হবেন। আর তোমারই বা দুঃখ কী, তুমি মাঝে মাঝে এসে আমাকে দেখে যাবে।'

'যা তুমি বলো, তাই হবে।' দামোদর বললে, 'তোমার মার কাছে গিয়েই থাকব।'

'হ্যাঁ, বলবে, নিমাই তার নিজের কথা শোনাবার জন্যেই তোমার কাছে আমাকে পাঠিয়েছে। আর সেই সঙ্গে তাঁকে মনে করিয়ে দেবে আমার গুহ্যকথা।'

কী গুহ্যকথা?

আমি বার-বার তাঁর ঘরে যাই, মিষ্টান্ন-ব্যঞ্জন সব খেয়ে আসি। আমি যে খাচ্ছি মা তা দেখছেন কিন্তু বাহ্যবিরহে তাকে স্বপ্ন বলে ভাবছেন। ভাবছেন আমার নিমাই তো নীলাচলে, সে বাস্তবে এ সব খায় কী করে? এ তবে আমার স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়।

মাঘী-সংক্রান্তিতে কী হল? বিচিত্র পিঠে-পায়েস ক্ষীর-ব্যঞ্জন রান্না করেছেন মা, কৃষ্ণে ভোগ লাগিয়ে বসেছেন ধ্যান করতে। আমার মূর্তিই তখন তাঁর কাছে স্ফূর্ত হল, অশ্রুজলে ভরে গেল দু'নয়ন। দেখলেন আমিই সব খাচ্ছি, দেখে মার সে কী অগাধ পরিতোষ! অশ্রু মুছে চোখ খুলে দেখলেন, পাত্র শূন্য, নিমাই-ই তা হলে সব নিঃশেষ করেছে। কিন্তু ক্ষণপরে বাহ্যবিরহে আবার তাঁর ভ্রান্তি হল। নিমাই তো নীলাচলে, সে এখানে এসে খায় কী করে? তবে বুঝি আমি কৃষ্ণের ভোগই লাগাই নি। অথচ পাকপাত্র অন্নব্যঞ্জনে ভরে আছে। দেখেও দেখছেন না মা। আবার স্নান সংস্কার করে ভোগ লাগালেন।

'মাকে বোলো,' প্রভু আরো বললেন দামোদরকে, 'তাঁর আজ্ঞাতেই আমি নীলাচলে আছি, আর তাঁর বিশুদ্ধ প্রেমবলেই বারে বারে যাচ্ছি তাঁর কাছটিতে। আমার নাম করে তুমি তাঁকে দণ্ডবৎ কোরো আর বোলো, তাঁর নিমাই ভালো আছে।'

মাকে ও অন্যান্য বৈষ্ণবকে দেবার জন্যে জগন্নাথের প্রসাদ আনালেন আলাদা করে। দিয়ে দিলেন দামোদরের সঙ্গে। দামোদর নদীয়ায় ফিরে চলল।

নদীয়ায় ফিরে এসে শচীমাতাকে সব বললে দামোদর। প্রণাম দিলে। প্রণাম দিলে। বললে, 'প্রভু আমাকে তোমার কাছে থাকতে বলেছেন, তোমাদের দেখাশোনা করতে—'

সন্ন্যাসী হয়েও নিমাই তাঁদের মঙ্গলচিন্তা করছে ভাবতে শচীমায়ের বুক স্নেহে-প্রেমে উথলে উঠল।

অদ্বৈত ও অন্যান্য বৈষ্ণবের সঙ্গেও দেখা করল দামোদর। প্রভুর পাঠানো প্রসাদ বিতরণ করল। সকলের প্রতি প্রভুর কী অপার করুণা ও স্নেহ, অনুভব করে সবাই অভিভূত হয়ে গেল।

কোনো মর্যাদা-লঙ্ঘন সহ্য করতে পারে না দামোদর, না কোনো স্বৈরাচার। যেখানে যেটুকু সে অবিধি দেখে, তিরস্কার করে, প্রয়োগ করে বাক্যদণ্ড। দামোদরের শাসনের ভয়ে সবাই সন্ত্রস্ত, সঙ্কুচিত, কারুরই আর অসঙ্গত বা অন্যায় কিছু করবার প্রবৃত্তি নেই।

একদিন হরিদাসের সঙ্গে মিলিত হলেন প্রভু। বললেন, 'যারা গো-ব্রাহ্মণ হিংসা করে সেই সব দুরাচার যবনদের কী ভাবে নিস্তার হবে? আমি তো কোনো পথ দেখি না।'

'ওদের নামাভাসে মুক্তি হবে।'

'নামাভাসে?'

'হ্যাঁ, অস্ত সঙ্কেতে।' বললে হরিদাস, 'ওরা কথায় কথায় ঘৃণাচ্ছলে হারাম বলে—হারামের যাই অর্থ হোক, উচ্চারণে তাই হা-রাম হয়ে যায়। অর্থে যার ঘৃণা উচ্চারণে তার মহাপ্রেম। অজামিলের সেই ছেলের উদ্দেশে নারায়ণ ডাকার মত। সঙ্কেত যাই হোক নামের তেজ নষ্ট হবার নয়।'

ভগবানের অসংখ্য নাম। তার প্রত্যেকটিরই অশেষ শক্তি। কথাপ্রসঙ্গে রসনায় যদি এসে পড়ে, তা হলেই হল। উচ্চারণ নাই বা করলে, যদি কখনো মনে পড়ে বা শুনে ফেল আকস্মিক, তা হলেও যথেষ্ট। সে নাম শুদ্ধবর্ণই হোক বা অশুদ্ধবর্ণই হোক, কিছু আসে-যায় না। সেই নামের অক্ষর গুচ্ছীকৃতই থাক বা পরস্পরবিচ্ছিন্নই থাক, ফল সমান। নামের শেষাংশও যদি অনুচ্চারিত থাকে, তা হলেও কাজ হবে। নাম অঙ্গহীন বলে ফল অঙ্গহীন হবে না। এমনি নামের মহিমা। দেহ-সুখ, বিষয় বা প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্যে যদি কেউ নাম ব্যবহার করে তা হলে সঙ্গে-সঙ্গে ফল পাওয়া যাবে না বটে, কিন্তু দেরিতে পাবে। নামাপরাধের ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত ফল করায়ত্ত নয়। দেহবিত্তাদির উদ্দেশ্যে নামকীর্তন

নামাপরাধ। সে ক্ষেত্রেও ফল একেবারে অলভ্য নয়, দেরিতে লভ্য।

ধৃতরাষ্ট্রকে কী বলছে বিদুর? বলছে: 'অকপটে আসক্তচিত্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করো। তিনি পাবনেরও পাবন, উত্তমশ্লোকদের শিরোভূষণ। তাঁর নাম-ভানুর আভাসমাত্র যদি অন্তরকুহরে প্রবেশ করে তা হলে মহাপাতকের অন্ধকারও নিমেষে দূরীভূত হয়।'

নামাভাসেই পাপক্ষয়, সংসারক্ষয়, সর্ববন্ধনবিমোচন।

'কিন্তু স্থাবরজঙ্গমের কী হবে?'

'যদিও তারা বাকশক্তিহীন, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা, তারাও উদ্ধার পাবে।' বললে হরিদাস, 'তুমি সরবে উচ্চকণ্ঠে যখন কৃষ্ণকীর্তন করেছ তখন জঙ্গম তা শুনতে পেয়েছে আর তাতেই তাদের মুক্তি। আর স্থাবরে তোমার ধ্বনির প্রতিধ্বনি উঠেছে, এ ঠিক প্রতিধ্বনি নয়, এ স্থাবরেরই নামকীর্তন। ঝারি-খণ্ডের পথে বৃন্দাবন যাবার সময় তুমি কী ভাবে সকলকে দিয়ে হরিনাম করিয়েছ তা আমাকে বলভদ্র বলেছে।'

'কিন্তু হরিদাস, সব জীবই যদি মুক্তি পায় তা হলে ব্রহ্মাণ্ড তো শূন্য হয়ে যাবে।'

'তুমি যতদিন মর্ত্যলোকে আছ ততদিন স্থাবরজঙ্গম সমস্ত জীব উদ্ধার পেয়ে বৈকুণ্ঠে যাবে।' বললে হরিদাস, 'কিন্তু যারা এখনো ভোগযোগ্য স্থূলদেহ পায় নি, সূক্ষ্মরূপে কারণসমুদ্রে অবস্থান করছে, তাদের কর্মফল উদ্বুদ্ধ হবে আর তারাই এসে নিজ-নিজ কর্মানুসারে স্থাবরজঙ্গম রূপে আবির্ভূত হবে। তারাই আবার ভরে তুলবে পৃথিবী।'

প্রভু যেন ধরা পড়ে গেছেন এমনি ভাবে নীরব রইলেন।

'আগে যেমন ব্রজে অবতীর্ণ হয়ে কৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডজীবের সংসার খণ্ডন করেছেন তেমনি তুমিও নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীবাসী সমস্ত স্থাবরজঙ্গমের উদ্ধার সাধন করবে।'

হরিদাসকে প্রভু আলিঙ্গন করলেন। বললেন, 'তুমি এসব কথা যদি বিশ্বাসও করো, যেন বাইরে রাষ্ট্র করে বেড়িয়ো না।'

কিন্তু এ কী? হরিদাসের দুয়ারে এ কে উপস্থিত? সনাতন না?

মথুরায় আর মন টিকছে না, প্রভুর জন্যে উতলা হয়ে যাত্রা করল পুরীর দিকে। গৌড়ের পথে গেল না, ঝারিখণ্ডের পথ নিলে। একেবারে একলা চলেছে সনাতন, একেবারে নিঃসহায়। অর্ধাশনে-অনশনে, চানা চিবিয়ে, কখনো

বা শুধু জল খেয়ে পথ ভাঙতে লাগল। আশ্বিনের জলের ছোবে গায়ে চুলচুনি দেখা দিল। ভাবল, আমি অত্যন্ত অপদার্থ, আমি কৃষ্ণ-ভজনের অযোগ্য। তাই আমার দেহে এ কুৎসিত ব্যাধি উপস্থিত হয়েছে। এ অশুচি শরীর নিয়ে কী করে প্রভুর মুখোমুখি হব? শুনেছি মন্দিরের নিকটেই তাঁর বাসা, সুতরাং মন্দিরে যেতেও আমার অধিকার নেই। যদি জগন্নাথের কোনো সেবকের সঙ্গে ছোঁয়া-ছুঁয়ি হয়ে যায় তা হলে আমার পাপের বোঝা আরো ভারী হবে। সুতরাং এ দেহ আর রাখব না। আত্মহত্যা করব।

রথযাত্রার আর দেরি নেই। রথের দিনে প্রভুকে দেখব, জগন্নাথকে দেখব, আর তাঁদের চোখের সামনে রথের চাকার নিচে দেহ ছাড়ব। তাতেই আমার পরম পুরুষার্থ লাভ হবে।

সনাতন এসে হরিদাসকে প্রণাম করল।

'তুমি? সনাতন?'

'হ্যাঁ, আমি। প্রভু কোথায়?' কতক্ষণে প্রভুকে একটু দেখবে তারই আশায় অস্থির সনাতন।

'প্রভু মন্দিরে গিয়েছেন উপলভোগ দেখতে।' বললে হরিদাস, 'এখুনি ফিরবেন।'

বলতে-বলতে প্রভু আবির্ভূত হলেন।

সেই চিত্তপ্রত্যাশিত প্রিয়মূর্তি। সেই গোবিন্দ-গৌরাঙ্গ।

দর্শনমাত্রই হরিদাস ভূতলে প্রণত হল। সঙ্গে-সঙ্গে সনাতন।

প্রভু হরিদাসকে তুলে আলিঙ্গন করলেন। হরিদাস বললে, 'সনাতনও আপনাকে প্রণাম করছে।'

'সনাতন?' প্রভু চমকে উঠলেন। বাহু প্রসারিত করে অগ্রসর হলেন আলিঙ্গন করতে।

সনাতন পিছু হটল।

'না, না, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে ছুঁয়ো না। আমি নীচ অধম অস্পৃশ্য।' সনাতন কেঁদে উঠল: 'আমার সারা অঙ্গে খোসপাঁচড়া—'

প্রভু নিষেধ শুনলেন না। জোর করে সনাতনকে আলিঙ্গন করলেন। সনাতনের কণ্ডুক্লেদ তাঁর গায়ে লাগল।

সনাতন অপরাধীর মত ম্লান হয়ে রইল। কিন্তু প্রভুর মুখে সর্বপবিজয়করা বরাভয় হাসি।

ভক্তরা সবাই এসে পড়ল। হরিদাসের ঘরের দাওয়ায় সবাইকে নিয়ে বসলেন প্রভু। সকলের সঙ্গে হরিদাসের পরিচয় করিয়ে দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'মথুরাবাসী বৈষ্ণবদের সব কুশল তো?'

'সমস্ত কুশল।' বললে সনাতন, 'আর আমার পরমমঙ্গল তোমার ঐ শ্রীচরণে।'

'শ্রীরূপ এতদিন এখানে ছিলেন—প্রায় দশ মাস। দিন দশেক আগে গৌড়ে গিয়েছেন। তাঁর মুখে শুনলাম তোমার ভাই অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়েছে।' বললেন প্রভু, 'রঘুনাথে অনুপমের দৃঢ় ভক্তি ছিল।'

অনুপমের দেহত্যাগের কথা এই প্রথম শুনতে পেল সনাতন। কিন্তু শোকে কাতর হল না। যেহেতু প্রভু পরমস্নেহে তাঁর রামভক্তির কথা উল্লেখ করলেন।

'বাল্যকাল থেকেই অনুপমের রামাসক্তি।' বলতে লাগল সনাতন, 'রাম-নামেই তার পরমস্পৃহা, রামায়ণগান নিজেও যেমন শোনে অন্যকেও তেমনি শোনাতে বলে। রামের ধ্যানে আর কীর্তনেই তার গভীর আবেশ। কিন্তু আমাদের, রূপ আর আমার ইচ্ছে, ও আমাদেরই মত কৃষ্ণভজন করুক। ওকে নিয়ে যাই কৃষ্ণকথার সভায়, পরমকৃষ্ণকথা ভাগবত শোনাই। একদিন আমরা ওকে স্পষ্ট বললাম, দেখ কৃষ্ণনামই পরম মধুর। একমাত্র কৃষ্ণেই সৌন্দর্য মাধুর্য প্রেম আর বিলাস অসীম হয়ে আছে। আমাদের দু'ভায়ের মত তুমিও কৃষ্ণকেই আশ্রয় করো। আমরা তিন ভাই একসঙ্গে কৃষ্ণকথারঙ্গে দিন কাটাই।'

বার-বার করে বলাতে অনুপমের বুঝি মন টলল। বড় দু' ভাই সমানে অনুরোধ করছে, কী করে প্রত্যাখ্যান করে? শেষ পর্যন্ত বললে, 'তোমাদের আদেশ কত আর লঙ্ঘন করব, দাও, দীক্ষামন্ত্র দাও, করব কৃষ্ণভজন।'

মুখে বলল বটে কিন্তু মন কিছুতেই রামের চিন্তা থেকে সরিয়ে নিতে পারল না। সারা রাত কেঁদে কাটাল, একবিন্দু ঘুম হল না। যার পায়ে একবার মাথা বেচেছি সে মাথা আর কোথাও রাখতে পারব না। বুক বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

সকালে অনুপম দাদাদের কাছে এসে দাঁড়াল। বললে, 'আমাকে ক্ষমা করুন। কৃপা করে আপনারা আমাকে রঘুনাথেরই চরণসেবা করতে দিন। পারলাম না, কিছুতেই রঘুনাথের পাদপদ্ম পারলাম না ছাড়তে। আপনারা আশীর্বাদ করুন, শুধু এই জন্ম নয়, জন্ম-জন্ম যেন রামভজনেই আমার জীবন যায়।'

আমরা তখন তাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, নিজের উপান্তে তার ঐকান্তিকী

নিষ্ঠা আছে কিনা দেখবার জন্যেই আমরা এই প্রস্তাব করেছিলাম।' তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে রামসেবা করে যাও।

'আমিও মুরারি গুপ্তকে এমনি একবার পরীক্ষা করেছিলাম। বললেন প্রভু, 'যে ভক্ত স্বরূপ-বিরূপ কোনো অবস্থাতেই তার প্রভুকে, তার উপাস্যকে ত্যাগ করে না, সেই ধন্য। আর যে প্রভু সগুণ-নিগুণ কোনো অবস্থাতেই তার ভক্তকে ছাড়ে না, দৈবদুর্বিপাকে ভক্ত বিচলিত হলেও যে প্রভু জোর করে তাকে টেনে নিয়ে আসে, ভক্ত বিচ্যুত হলেও যে নিজে অচ্যুত থাকেন, সেই উপাস্যও ধন্য।'

'সেই ভক্ত ধন্য যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য যে না ছাড়ে নিজ জন॥
দুর্দৈবে সেবক যদি যায় অন্যস্থানে।
সেই ঠাকুর ধন্য তারে চুলে ধরি আনে॥'

হরিদাসের ঘরেই থেকে গেল সনাতন। প্রভু বললেন, 'আর কথা কী! দু'-জনে একসঙ্গে থাকো, কৃষ্ণনাম-আস্বাদ-সমুদ্রে স্নান করো সর্বক্ষণ।'

গোবিন্দই প্রসাদ নিয়ে আসে। সনাতন মন্দিরে যায় না, মন্দিরের চক্র দেখে দূর থেকে প্রণাম করে। হোক প্রসাদ, হোক প্রণাম, তবু দেহত্যাগের সঙ্কল্প ত্যাগ করেনি সনাতন। যে দেহ কণ্ডুতে কলুষিত সে দেহ অযোগ্য, অসার। রথের চাকায় পিষ্ট হয়ে গেলেই সে দেহের সদ্গতি।

সহসা সে দিন প্রভু চলে এলেন হরিদাসের বাসায়। ডাকলেন সনাতনকে। বললেন, 'শোনো, দেহত্যাগে কৃষ্ণ পাওয়া যায় না।'

সনাতন চমকে উঠল। অন্তর্যামী মনের গূঢ় বাসনাটি পর্যন্ত জেনে ফেলেছেন।

'কৃষ্ণ পাওয়া যায় ভজনে। দেহত্যাগেই যদি কৃষ্ণ পাওয়া যেত, তবে আর ভাবনা কী ছিল, কোটি-কোটি লোক এক মুহূর্তেই আত্মহত্যা করত। কৃষ্ণ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায় ভক্তি। দেহত্যাগে তমোধর্ম, আর তমোরজোধর্মে কৃষ্ণপ্রাপ্তি অসম্ভব। ভক্তি ছাড়া কৃষ্ণে প্রেম হয় না, আর প্রেম ছাড়া কৃষ্ণ কোথায়?'

কিন্তু রুক্মিণী যে অনশনে দেহপাত করতে চেয়েছিল, গোপীরাও যে উন্মুখ হয়েছিল আত্মহত্যায়—তার কী?

সে বাসনা কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্যে নয়, কৃষ্ণবিরহযন্ত্রণা থেকে ত্রাণ পাবার জন্যে। এমনই সে গাঢ়ানুরাগ, মরণ হয় না, কৃষ্ণ আকৃষ্ট হয়ে নিজে এসে দেখা দেন।

'তুমি নীচ জাতি কে বললে? শুধু যবনের সংস্রবে দীর্ঘকাল ছিলে বলে দৈন্য-বশত নিজেকে নীচ বলছ। কিন্তু ভক্তের আবার জাতি কী? যে কৃষ্ণ ভজন করে সেই উচ্চ, সেই বৃহৎ। ভক্তিতে সবাই সমজাতি। আর যদি সত্যি দৈন্য ধরো, অভিমান থেকে মুক্ত হও, দেখবে তোমার প্রতিই ভগবানের বেশি দয়া।'

'যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার॥
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥'

ভগবানের বেশি দয়া! তা কি এখুনি চোখের সামনে প্রতিমূর্ত নয়?

'ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি, আর সেই নয় অঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্তন।' বললেন প্রভু, 'নিরপরাধে নাম নিলেই প্রেমধন মিলে যাবে।'

তা হলেই বোঝা যাচ্ছে সনাতনের দেহত্যাগ প্রভুর মনঃপূত নয়।

আমি ক্ষুদ্র জীব, আমার স্বাতন্ত্র্য কিছু নেই। যৈছে নাচাও তৈছে নাচি।

কিন্তু জিজ্ঞেস করি, আমাকে বাঁচিয়ে রেখে তোমার কী লাভ হবে?

'যখন তুমি আমাতে আত্মসমর্পণ করেছ তখন তোমার দেহে তোমার আর কোনো স্বত্ব-স্বামিত্ব নেই।' বললেন প্রভু, 'যা এখন পরের দ্রব্য তা তুমি নষ্ট করবে কোন অধিকারে? তোমার শরীরে আমার ভীষণ দরকার, অনেক প্রয়োজন সাধন করব একে দিয়ে।'

সনাতন হতবাক।

'মায়ের আদেশে আমি নীলাচলবাসী, অন্যত্র গিয়ে ধর্মশিক্ষা দেবার আমার সুযোগ নেই।' বললেন প্রভু, 'জানো তো আমার নিজ প্রিয়স্থান মথুরা আর বৃন্দাবন। আমার ইচ্ছে তোমরা দু'ভাই, রূপ আর তুমি, ব্রজভূমে থেকে সমস্ত লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করো। ভক্ত-ভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম, সর্বতত্ত্বের নির্ধার করো, বৈষ্ণবের কৃত্য আর আচার শেখাও, শেখাও বৈরাগ্য, কৃষ্ণ-অনুরাগ। যে দেহ দিয়ে আমি এত সব কাজ করতে চাই তা তুমি ছাড়বে কোন হিসাবে?' হরিদাসের দিকে তাকালেন: 'পরের কাছে যে ধন গচ্ছিত আছে তা সনাতন কী করে বিলিয়ে দেয়, কী করে খরচ করে? তুমি ওকে সাবধান করে দিও, আমার ধন যেন ও চুরি করে না পালায়।'

হরিদাস বললে, 'আমরাই সব করি এই অভিমান যে কত মিথ্যা, এই আবার বুঝলাম। সনাতন ঠাকুরও বুঝেছেন।'

সনাতন সহর্ষে বললে, 'কে নিয়ন্তা, কে তাকে নাচাচ্ছে কাঠের পুতুল তা জানে না। যেমন নাচাও তেমনি নাচে। যদি বলো বাঁচতে হবে, করতে হবে তোমার কাজ, রুগ্ন ভগ্ন দেহেও বেঁচে থাকব, পঙ্গু হাতেও তোমার কাজ সম্পূর্ণ করে যাব। তুমিই হৃদয়ে প্রেরণা দেবে, বাহুতে বহুবল, তুমি সৃষ্টি করবে সাধনের অনুকূল পরিবেশ।'

॥ ৬৭ ॥

'তোমার ভাগ্য অপরিসীম।' সনাতনকে বললে হরিদাস, 'তোমার দেহকে প্রভু তাঁর নিজধন বলেছেন। নিজদেহে মথুরামণ্ডলে যে কাজ করতে পারছেন না তাই তোমাকে দিয়ে করাচ্ছেন। বরং আমার দেহই বৃথা গেল। ভারতবর্ষে জন্ম নিলাম অথচ কারু উপকার করতে পারলাম না।'

পরোপকারই ভারতবর্ষের ধর্ম। কী বলছেন প্রভু?

'ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার॥'

শ্রীকৃষ্ণও বলছেন ব্রজবালকদের, 'প্রাণ অর্থ বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা পরহিতাচরণই দেহীদের জন্মের সাফল্য। সর্বপ্রাণীর উপজীব্যস্বরূপ বৃক্ষের দিকে চেয়ে দেখ। যাচক কখনো এর কাছ থেকে বিমুখ হয়ে ফিরে যায় না। পত্র পুষ্প ফল ছায়া মূল বল্কল অস্থি গন্ধ নির্যাস ভস্ম সমস্ত কিছু দিয়ে সে প্রাণীর উপকার করে।'

'তুমি কী যে বলো তার ঠিক নেই।' বললে সনাতন, 'তুমি যে পরোপকার করছ তা অতুলনীয়। প্রভুর অবতারের প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে নামপ্রচার। তুমি প্রত্যহ তিন লক্ষ নামকীর্তন করছ, যে শুনছে তারও সংসার-বীজ ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। ভারতভূমিতে তোমার জন্মই সার্থকতম। তুমি তো শুধু প্রচার কর না তুমি আচরণ কর, তাই তুমিই সকলের গুরু।'

'আচার-প্রচার-নামের কর দুই কার্য।
তুমি সর্বগুরু সর্বজগতের আচার্য॥'

প্রভু যমেশ্বরটোটায় আছেন, পুরীতে খবর পাঠালেন সনাতন যেন মধ্যাহ্ন-ভিক্ষার সময় আসে।

সনাতন আছে হরিদাসের সঙ্গে, সিদ্ধবকুলের স্থানে। প্রভুর ডাক পেয়ে

তক্ষুণি সে বেরিয়ে পড়ল।

সিদ্ধবকুল হতে যমেশ্বর যাবার দুটো রাস্তা। একটি মন্দিরের সিংহদ্বার পেরিয়ে শহরের রাজপথ দিয়ে, অন্যটি সমুদ্রতীর ধরে। প্রথম পথটাই অপেক্ষাকৃত সহজ ও অকষ্টসাধ্য।

দ্বিতীয় পথটা দীর্ঘ, নির্জন, বালুকাপূর্ণ। মধ্যাহ্নের বেলা, তবু সনাতন দ্বিতীয় পথই নির্বাচন করল। গাছ-গাছালি নেই, প্রাচীরের অন্তরাল নেই, ছায়ার তন্তুমাত্র সম্ভাবনা নেই, তবু এই রুক্ষ তপ্ত পথেই যাত্রা করল সনাতন। কিন্তু প্রভু ডেকেছেন এই আনন্দে সে এত ভরপুর যে তপ্ত বালিতে তার পা পুড়ছে এ তার খেয়াল নেই। প্রভু-তন্ময়তায় তপ্ত বালিও সুখস্পর্শ হয়ে উঠেছে। দু'পায়ে ফোস্কা পড়েছে—তা পড়ুক।

ভিক্ষাশেষে প্রভু বিশ্রাম করছেন সনাতন এসে পৌছুল। ভিক্ষাবশেষ গোবিন্দ নিয়ে এল তার জন্যে। সনাতন প্রসাদ পেল।

প্রসাদান্তে প্রভুর কাছে এলে প্রভু জিজ্ঞেস করলেন, 'সনাতন, কোন্ পথে এলে?'

'সমুদ্রতীরের পথ দিয়ে এসেছি।'

'সে কি, সিংহদ্বারের পথ দিয়ে এলে না কেন? সিংহদ্বারের পথ ঠাণ্ডা, আর সমুদ্রতীরের পথ তপ্তবালিতে দুঃসহ।' প্রভু কাতরমুখে বললেন, 'তোমার পায়ে ফোস্কা পড়ে গিয়েছে, তুমি হাঁটলে কী করে?'

'পায়ের ফোস্কা টের পাইনি। তা ছাড়া,' সনাতন অপরাধীর মত বললে, 'তা ছাড়া সিংহদ্বারের পথে যাবার আমার অধিকার নেই। সে পথে জগন্নাথের কত সেবক যাতায়াত করছে, যদি অতর্কিতে কারু সঙ্গে আমার গাত্রস্পর্শ হয়ে যায় তা হলে আমার অপরাধের শেষ থাকবে না। আমার স্পর্শে দেবসেবার কাজ অপবিত্র হবে এ আমার কাছে অসহ্য।'

সনাতনের দৈন্য ও মর্যাদাবোধ দেখে প্রভু তুষ্ট হলেন। বললেন, 'তুমি অপবিত্র এ তোমাকে কে বলল? তুমি জগৎ-পাবন, তোমার স্পর্শে মুনি-ঋষিরা পবিত্র হয়। তবু সম্মানীকে উপযুক্ত মর্যাদা করাই ভক্তের স্বভাব। এই মর্যাদাপালনই সাধুর অলঙ্কার। অভিমানীরাই অন্যের মর্যাদারক্ষণে অনিচ্ছুক। তোমার অন্তরে অভিমানের লেশ নেই, তাই তোমার ঐ ভক্তের ব্যবহার—তোমার মত এমনটি আর কোথায়?'

সনাতনকে আলিঙ্গন করলেন প্রভু। তার কণ্ডুরস প্রভুর গায়ে লাগল।

কত নিষেধ করছে, তবু প্রভু শোনেন না। ক্ষোভে লজ্জায় শীর্ণ ও মলিন হল সনাতন।

পরে একদিন জগদানন্দকে সে তার দুঃখের কথা জানাল। বললে, 'প্রভুকে দর্শন করে নিজের দুঃখ ঘুচাতে এলাম নীলাচলে, কিন্তু মনে যা বাসনা ছিল তা প্রভু পূর্ণ করতে দিলেন না। দিলেন না রথের চাকায় দেহত্যাগ করতে। অথচ তাঁর অঙ্গস্পর্শ করে কত যে অপরাধ হচ্ছে তার কূলকিনারা নেই। হিতের জন্যে এলাম, বিপরীত হয়ে গেল। কী করি বলতে পারো?'

জগদানন্দ বললে, 'তুমি নীলাচল ত্যাগ করো। বৃন্দাবনই তোমার উপযুক্ত বাসস্থান, রথযাত্রার পর তুমি বৃন্দাবনে চলে যাও।'

সনাতন আশ্বস্ত হল। 'ঠিক বলেছ। বৃন্দাবনই আমার প্রভুদত্ত দেশ, আমি নীলাচল ছেড়ে সেখানে গিয়েই বাস করব।'

হরিদাসের স্থানে প্রভুকে দেখে স্পর্শভয়ে সনাতন পিছু হটে যাচ্ছিল, প্রভু জোর করে সনাতনকে আলিঙ্গন করে ধরলেন।

সনাতন বললে, 'প্রভু, আমার দোষ আর বাড়িও না। আমি এমনিতেই নীচ, তাই এখন এই বীভৎস রোগে ভুগছি। তোমার অবশ্য ঘৃণালেশ নেই কিন্তু আমি তো বুঝি কত্তুর রসে-রক্তে তোমার পবিত্র গাত্র কলুষিত করে আমি কী ঘোর অপরাধ করছি। তাই, আজ্ঞা করুন, রথ দেখে আমি বৃন্দাবনে চলে যাই। জগদানন্দ পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তারও সেই মত।'

'কালকের ছাত্র জগা, তার কি-না এত অহঙ্কার তোমাকে উপদেশ করে।' রুষ্ট হলেন প্রভু, বললেন,' 'সর্বব্যাপারে তুমি তার গুরুতুল্য, ওর নিজের দৌড় কতদূর তা বুঝি ওর খেয়াল নেই? তুমি আমার উপদেষ্টা, তুমি প্রামাণিক, তুমি মাননীয় জন, তোমার মূল্য ও কী বুঝবে? ও নিতান্ত অর্বাচীন।'

'জগদানন্দের কী ভাগ্য!' সনাতন বললে, 'আপনি তাকে তিরস্কার করছেন। যে আপনার জন তাকেই তো লোকে তর্জনতাড়ন করে। আর আমি আপনার অনাত্মীয়। তাই তো আমাকে আপনি গৌরবস্তুতি করছেন। আপনার ভর্ৎসনা মধুর আর প্রশংসা তিক্তের চেয়েও তিক্ত। আমার মত হতভাগ্য আর কে আছে? আমি আপনার আত্মীয়তা পেলাম না।'

প্রভু বুঝি একটু লজ্জিত হলেন। বললেন, 'তোমার চেয়ে জগদানন্দ আমার কাছে বেশি প্রিয় নয়, তবে জানো তো আমি মর্যাদা লঙ্ঘন সহ্য করতে পারি না, সে কেন তোমাকে উপদেশ করতে যাবে? তোমাকে যে আমি প্রশংসা করি তা

বহিরঙ্গবুদ্ধিতে নয়, তোমাকে বাইরের লোক মনে করে নয়, তোমার এত গুণ, তোমাকে স্তুতি না করে থাকা যায় না। বহু লোকের প্রতি প্রীতি থাকলেও প্রীতি সর্বক্ষেত্রে সমান নয়। রূপে ও প্রকৃতিতে ও মাত্রায় তাতে তারতম্য থাকা সম্ভব। তোমার দেহ তোমার কাছে বীভৎস কিন্তু আমার কাছে অমৃততুল্য। তোমার দেহ অপ্রাকৃত, চিন্ময়, অথচ বুদ্ধিদোষে তুমি তা প্রাকৃত মনে করছ। আর, যদি তা প্রাকৃতও হয়, তা হলেও তাকে উপেক্ষা করা চলে না। জ্ঞানযোগীর কাছে আবার ভালো-মন্দ কী, ভদ্রাভদ্র কী! তার কাছে সমস্তই ব্রহ্ম।' 'ভদ্রাভদ্র বস্তুজ্ঞান নাহিক প্রাকৃতে।'

ভক্তিযোগের চোখে দেখতে গেলে তোমার দেহ চিন্ময়, জ্ঞানযোগের চোখে দেখতে গেলেও তা পবিত্র-অপবিত্রের বাইরে এবং সেই অর্থে অপ্রাকৃত। সুতরাং যে দিক থেকেই দেখ, তোমার দেহ অশ্লাঘ্য নয়, কদর্য নয়, বর্জনীয় নয়।

জ্ঞানযোগের কথা বলছেন প্রভু।

অবস্তুর আবার দ্বৈত কী? ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু আর সমস্তই অসার। পদার্থই যখন মিথ্যে তখন তার সম্বন্ধে ভদ্রাভদ্র জ্ঞানও মিথ্যে। যে জ্ঞানবাদী সে তো সমদর্শী, সে ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল এক দেখে, গরু হাতী কুকুরেও কোনো বৈষম্য নেই। লোষ্ট্র প্রস্তর কাঞ্চনও তার কাছে সমান। সমদর্শীই জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা।

'শোনো সনাতন, আমি তো সন্ন্যাসী,' বললেন প্রভু, 'আমার ধর্মও সমদর্শন। চন্দনে ও পঙ্কে আমার সমবুদ্ধি। তাই তোমাকে আমি ত্যাগ করতে পারি না। তোমাকে ত্যাগ করলে আমার নিজ ধর্ম, সন্ন্যাসধর্ম ক্ষুণ্ণ হয়।'

হরিদাস বললে, 'প্রভু, এ তোমার পরিহাস। তোমার প্রতারণা। জ্ঞানযোগের কথা বাজে কথা। আমি আসল কথাটি জানি।'

'সে আবার কোন কথা?' প্রভু হরিদাসের দিকে তাকালেন।

'আসল কথা হচ্ছে, আমরা অধম, আমরা পতিত আর তুমি দীনের প্রতি, পতিতের প্রতি স্বভাবদয়ালু।' বললে হরিদাস, 'তুমি তোমার দীনদয়ালগুণে আমাদের অঙ্গীকার করে নিয়েছ। ঘৃণ্য জেনেও স্থান দিয়েছ পাদপদ্মে।'

'না, তা নয়।' বললেন প্রভু, 'তোমাদের আমি লাল্য মনে করি, আর নিজেকে মনে করি লালনকর্তা। মা যেমন সন্তানের ক্লেদমালিন্য ধুয়ে-মুছে দেন, তেমনি। মার মধ্যে কি ঘৃণা থাকে না দোষজ্ঞান থাকে? মার মধ্যে যে ভাব তাকে তুমি শুদ্ধ দয়াও বলতে পারো না। মার মধ্যে শুধু স্নেহসুখ, শুধু প্রীতিময়ী পরিচর্যা। সনাতনের প্রতিও আমার সেই মাতৃস্নেহ। শিশু সন্তানের গায়ে যদি

কণ্ডুয়ন থাকে মা কি তাকে কোলে নেয় না, না কি কোলে নিতে তার ঘৃণা হয়? আমার তো মনে হয় স্নিগ্ধ বলেই মার সন্তানকে কোলে নিতে বেশি আনন্দ।'

'তোমাকে 'লালা' মানি আপনাকে 'লালক' অভিমান।
লালকের লাল্যে নহে দোষ-পরিজ্ঞান॥
মাতার স্বভাবে বালকের অমেধ্য লাগে গায়।
ঘৃণা নাহি উপজয়, আরো সুখ পায়॥
লাল্যমেধ্য লালকে চন্দনসম ভাষ।
সনাতনের ক্লেদে আমার ঘৃণা না জন্মায়।'

'সে তো একবার বাসুদেবের বেলায় দেখেছি।' বললে হরিদাস, 'তার গলিত কুষ্ঠে কীট পর্যন্ত জন্মেছিল। তোমার আলিঙ্গনে সে কীটমুক্ত কৃষ্ণমুক্ত হয়ে গেল। কন্দর্পের কান্তি জাগল শরীরে। কৃপার তরঙ্গ, তোমার সে আলিঙ্গনের মহিমা কে বুঝতে পারে?'

'বৈষ্ণবদেহ প্রাকৃত নয়।' বললেন প্রভু, 'বৈষ্ণবদেহ চিদানন্দময়। দীক্ষাকালে ভক্ত যেই কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করল, অমনি সে কৃষ্ণের আত্মসম হয়ে উঠল। ভগবানে সমর্পিত ভক্তদেহ তাই চিন্ময়ত্ব অর্জন করল। তাই সনাতন, তোমার দেহ নিত্যপবিত্র, তোমাকে আলিঙ্গন করে আমি নিত্যতৃপ্ত নিত্যসুখী।'

বলে আরেকবার আলিঙ্গন করলেন। আর তখুনি সকলে দেখল, সনাতনের শরীরে আর কণ্ডু নেই, সর্ব অঙ্গ মসৃণ সোনার মত ঝলমল করে উঠেছে।

'এই তোমার ভঙ্গি।' উল্লসিত হয়ে উঠল হরিদাস: 'ঝাড়িখণ্ডের জল খাইয়ে সনাতনের দেহে কণ্ডু করালে, তারপর তাকে পরীক্ষা করলে যন্ত্রণায় পড়ে ভগবানে দোষ দেয় কিনা, কর্তব্যে বিমুখ হয় কিনা, পরে নিজেই আবার ব্যাধির নিরাকরণ করলে। তোমার এ লীলারহস্য কে দেখে কে বোঝে।'

'এ বৎসরের শেষে তোমাকে বৃন্দাবনে পাঠাব' সনাতনকে আশ্বস্ত করে বিদায় হলেন প্রভু।

রথযাত্রা হয়ে গেল। গৌড়ীয় ভক্ত যারা এসেছিল বেণু-শিঙা খোল-করতাল নিয়ে, ফিরে গেল বাঙলায়। দোলযাত্রার শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করল সনাতন। তারপর যাত্রা করল।

প্রভু যে পথে গেছেন সনাতন সেই পথ ধরল। কোন গ্রামে কোন নদীতে কোন পাহাড়ে প্রভুর কী কী লীলা হয়েছে বলভদ্র ভট্টাচার্যের কাছ থেকে সব জেনে নিল। সেই সব দেখতে দেখতে প্রেমাবেশে পৌঁছুল বৃন্দাবন।

ওদিকে রূপও নিশ্চিন্ত হল। যা বিষয়-সম্পত্তি ছিল কুটুম্ব ব্রাহ্মণ ও দেবালয়ে বণ্টন করে দিল। মনের যত-কিছু গোপন কথা বা ইচ্ছা ছিল তা-ও উগরে দিয়ে এল। কিছুই আর লুকোবার নেই, চিন্তিত করবার নেই। অন্তরে-বাহিরে ঝাড়া-হাত-পা হয়ে গেল।

সে-ও এসে মিলল সনাতনের সঙ্গে।

লুপ্ত তীর্থ প্রকট করবার কাজে লেগে গেল দু'জনে। লেগে গেল বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠায়। কৃষ্ণসেবা কৃষ্ণনাম-প্রচারে

তাদের ভাইপো, বল্লভের ছেলে শ্রীজীবও গৌড় থেকে চলে এল বৃন্দাবন।

রাসকেলিতে প্রভুকে প্রথম দেখে শ্রীজীব। তার অনেক দিন পরে একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখে কৃষ্ণ-বলরাম এসেছে। আবার কতক্ষণ পরে দেখে, কৃষ্ণ-বলরাম কোথায়, এ যে গৌর-নিতাই। যুগলমূর্তির পায়ে শ্রীজীব লুটিয়ে পড়ল। দু'জনেই তার মাথায় পা রাখলেন। প্রভু বললেন, তোমাকে নিত্যানন্দের চরণে সমর্পণ করে দিচ্ছি। নিত্যানন্দ বললেন, আমার প্রভুকে দেখ। প্রভুই তোমার সর্বস্ব হোক।

ঘুম ভাঙতেই শ্রীজীব দেখল রাত্রি আর নেই। অধ্যয়নের ছলে সে নবদ্বীপ ছুটল। শ্রীবাস-অঙ্গনে দেখা পেল নিত্যানন্দের। নিত্যানন্দ বললে, 'তোমার সঙ্গে দেখা করতেই খড়দহ থেকে এখানে এসেছি। বলতে এসেছি, তুমিও বৃন্দাবনে যাও। তোমাদের বংশের সকলেরই বৃন্দাবন বাস নির্ধারিত হয়েছে।'

'আপনি আমাকে কৃপা করুন।'

নিত্যানন্দের কৃপা ছাড়া ব্রজবাসের ফল মিলবে না। নিত্যানন্দই মূল ভক্ত-তত্ত্ব, তার কৃপা হলেই ভক্তির কৃপা হবে। আর ভক্তির কৃপা না হলে কিসের রাধাকৃষ্ণের করুণা!

তাই 'নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে।'

আবার ঐ তিনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রঘুনাথ দাস।

অতি প্রসন্ন ধর্ম সুন্দর রূপে অনুষ্ঠিত হলেও কিছু নয় যদি না হরিকথায় রতি হয়। যদি নামানন্দের পথই না উন্মুক্ত হয় তা হলে ধর্মানুষ্ঠানও বৃথা শ্রম।

দৈন্যার্ণবে শ্রীচৈতন্য আমার মহাবৈদ্য। আমি বৈগুণ্যকীটকলিত, আমি পৈশুন্যব্রণপীড়িত, আমি ভক্তিহীন দীন দরিদ্র, আমি কোথায় যাব? আমার কে আছে? আমি শুধু দীনবন্ধু শ্রীচৈতন্য শরণ নিলাম।

প্রভুর কাছে কৃষ্ণকথা শুনতে এসেছে প্রদ্যুম্ন মিশ্র, নীলাচলের এক ব্রাহ্মণ।

প্রভু বললেন, 'রামানন্দ রায়ের কাছ থেকেই আমার কৃষ্ণকথা শোনা। তুমি তার কাছে যাও। সেই তোমাকে তৃপ্ত করবে।'

রামানন্দের বাড়ি গিয়ে রামানন্দের দেখা পেল না প্রদ্যুম্ন। চাকর বললে, নিভৃত উদ্যানে দু'জন সুন্দরী যুবতী দেবদাসীকে রামানন্দ অভিনয় শিক্ষা দিচ্ছে। নিজের হাতেই স্নান-মার্জন করে সাজসজ্জা পরিয়ে দিচ্ছে। নিজের লেখা নাটক, নাম জগন্নাথবল্লভ, তাই এত সূক্ষ্ম মনোযোগ! তাই নিজের হাতে সমস্ত নিখুঁত করার চেষ্টা।

'স্বহস্তে করান তাঁর অভ্যঙ্গ মর্দন।
স্বহস্তে করান স্নান গাত্র-সম্মার্জন॥
স্বহস্তে পরান বস্ত্র সর্বাঙ্গ-মণ্ডন।
তবু নির্বিকার রায় রামানন্দের মন॥'

প্রদ্যুম্ন বিরক্ত হয়ে ফিরে এল প্রভুর কাছে। রামানন্দের বিরুদ্ধে নালিশ করল। এই আপনার রামানন্দ? এমন লোক কৃষ্ণকথার অধিকারী?

'হ্যাঁ, সেই প্রকৃত অধিকারী!' বললেন প্রভু, 'চিত্তচাঞ্চল্যের এত কারণ থাকা সত্ত্বেও রামানন্দ বিকারশূন্য।'

'নির্বিকার দেহ-মন কাষ্ঠ-পাষাণ সম।
আশ্চর্য তরুণী স্পর্শে নির্বিকার মন॥'

ব্রজেন্দ্রনন্দনকৃষ্ণ ব্রজগোপীদের সঙ্গে রাসলীলা করছেন। যে শ্রদ্ধান্বিত হয়ে সেই লীলাকথা শোনে ও বর্ণনা করে তার মধ্যে সত্ত্ব রজ তম এই তিন গুণের বিকার আর থাকে না। চিত্তের যত দুর্বাসনা সব ঐ তিন গুণের বিকার থেকে। গুণবিকার লোপ পেলে দুর্বাসনারও নিরসন হয়। দুর্বাসনা গেলেই ভক্তি জাগে। শ্রবণে কীর্তনে সে-ভক্তি প্রেম-মাধুর্যে প্রগাঢ় হয়ে ওঠে।

'ব্রজবধূসঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদিবিলাস
যেই ইহা কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস।
হৃদ্‌রোগ কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়।
তিনগুণ ক্ষোভ নাহি, মহাধীর হয়॥
উজ্জ্বলমধুর প্রেম ভক্তি সেই পায়।
আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্যে বিহরে সদায়॥'

'রামানন্দের ভজন রাগমার্গে।' বললেন প্রভু, 'তার দেহ সিদ্ধদেহ, তার মন অপ্রাকৃত। সেই তো ঠিক-ঠিক বলবে কৃষ্ণকথা। যাও, তার কাছেই ফিরে

যাও। বোলো আমি তোমাকে পাঠিয়েছি।'

প্রদ্যুম্ন ফিরে গেল রামানন্দের কাছে। বললে, 'আপনার কাছে কৃষ্ণকথা শোনবার জন্তে প্রভু আমাকে পাঠিয়েছেন।'

শুনে রামানন্দের প্রেমাবেশ হল। শুরু করল কৃষ্ণকথা। রসামৃতসিন্ধুতে মিশ্রকে নিয়ে ডুবল রামানন্দ। দিনের অন্ত হয়ে যায় কিন্তু কথার অন্ত হয় না।

'শোনো, তোমাকে আসল রহস্যটা বলি।'

'কী?'

'আমার মুখে যত কৃষ্ণকথা শুনছ তার বক্তা কিন্তু আমি নই, তার বক্তা গৌরচন্দ্র। যেমন বলাচ্ছেন তেমনি বলছি।'

সেই কথাই প্রভুর কাছে নিবেদন করল মিশ্র।

'কেমন দেখলে রামানন্দকে?'

'মূর্তিমান কৃষ্ণপ্রেম।'

'কেমন শুনলে?'

'অপূর্ব। কিন্তু উনি বললেন, সবই আপনার কথা। উনি বীণা, আপনিই বীণকার।'

'রামানন্দ বিনয়ের খনি।' বললেন প্রভু, 'মহাভক্তদের রীতিই এই, নিজের গুণলেশও তারা প্রচার করে না।'

রামানন্দ শূদ্র আর প্রদ্যুম্ন মিশ্র ব্রাহ্মণ। শূদ্রদ্বারে পাঠালেন ব্রাহ্মণকে, তার বর্ণাভিমান চূর্ণ করতে। ভক্ত-সম্পত্তি ব্রাহ্মণেরই একচেটে নয়, শূদ্র যদি ভক্ত হয় তা হলে তার থেকে পাঠ নিতে ব্রাহ্মণের কেন অভিমান থাকবে? গৃহস্থ যদি ভক্ত হয় তবে সন্ন্যাসী-পণ্ডিতও বা কেন কৃষ্ণকথার জন্তে তার শরণ নেবে না? কৃষ্ণকথাবেত্তা যবন হরিদাস কার না গুরু হবার যোগ্য?

'সন্ন্যাসি-পণ্ডিতগণের করিতে সর্বনাশ।
নীচশূদ্রদ্বারে করে ধর্মের প্রকাশ॥'

বাঙলা দেশ থেকে এক পণ্ডিত এসেছে প্রভুকে স্বরচিত কবিতা শোনাতে। কবিতায় কী আছে? গৌরচন্দ্রের মহিমাবর্ণনা আছে। তবে পড়ো শুনি। ভক্তরা শুনে প্রশংসা করল, চমৎকার হয়েছে। কিন্তু এ প্রশংসায় কবির মন উঠল না। স্বয়ং প্রভু যদি প্রশংসা করতেন!

ভগবান আচার্যের সঙ্গে চেনা ছিল, কবি তাকে গিয়ে ধরল।

ভগবান বললে, 'দাঁড়াও আগে স্বরূপ দামোদরকে শোনাও। সে যদি

অনুমতি করে তবেই প্রভু শুনতে সম্মত হবেন। রসাভাব বা শাস্ত্রবিরোধ সহ্য করতে পারেন না প্রভু, তাই পূর্বাহ্ণেই রচনা যাচাই করে নেওয়া দরকার। স্বরূপের মত রসদক্ষ আর কে আছে? তাকে যে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, প্রভু চান না সে মর্যাদার ব্যতিক্রম হয়।'

স্বরূপের কাছে গিয়ে সুপারিশ করল ভগবান।

'আমি শুনেছি। খুব সুন্দর হয়েছে।'

'তুমি তো সারল্যের অবতার, যা শোনো তাই তোমার কাছে সুন্দর। কিন্তু ব্যাকরণ জানো না, অলঙ্কার বোঝো না, রসবিচারে যার নৈপুণ্য নেই, সে কৃষ্ণলীলা লিখবে কী?' স্বরূপ বিরক্ত হয়: 'চৈতন্যলীলা তো আরো দুরূহ। আর শুধু শাস্ত্রে-ব্যাকরণে অভিজ্ঞতা থাকলেই চলে না, ভগবৎকৃপার প্রয়োজন। যে গৌরগতচিত্ত, গৌরপাদপদ্ম যার প্রিয়ধন, শুধু সেই কৃষ্ণলীলাবর্ণনে সমর্থ।'

'কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা সে করে বর্ণন।
গৌরপাদপদ্ম যার হয় প্রাণধন।'

'সবই ঠিক তবু তুমি একবার শুনে দেখ না—'

আরো অনেকে অনুরোধ করতে স্বরূপ রাজি হল।

কবি পড়তে শুরু করল। প্রথমে নান্দীশ্লোক:

'বিকচকমলনেত্রঃ শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে
কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মভাং যঃ প্রপন্নঃ।
প্রকৃতিজড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ
স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ॥'

'অর্থ বলো।'

কবি অর্থ বললে: 'স্বভাবজড় অসংখ্য জীবের চৈতন্য সম্পাদন করবার জন্যে যে স্বর্ণবর্ণকান্তি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রফুল্লকমলনয়ন জগন্নাথের দেহে ইহলোকে আবির্ভূত হয়েছেন তিনি তোমার মঙ্গলবিধান করুন।'

'তার মানে জগন্নাথ দেহ আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আত্মা?' স্বরূপ দামোদর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল: 'তার মানে জগন্নাথ থেকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পৃথক? ঈশ্বরে তুমি দেহ-দেহী ভেদ করলে? ঈশ্বরের স্বরূপ ও দেহ দুই-ই চিদ্‌ঘন বস্তু। স্বরূপ বা আত্মাও চিদানন্দময়, দেহ বা বিগ্রহও চিদানন্দময়। যিনি পূর্ণানন্দ ষড়ৈশ্বর্য স্বয়ং ভগবান সেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে তুমি ক্ষুদ্র এক দেহধারী জীব বানালে?'

দামোদরের বিচারে সকলে চমৎকৃত হল। কী করে যে তারা কবির প্রশংসা

করেছিল, তাই ভেবে লজ্জায় মিশে গেল মাটির সঙ্গে। আর বঙ্গকবি অধোমুখে কাঁদতে বসল। ছি ছি, কী পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞতা নিয়ে কৃষ্ণকথা বলতে বসেছি!

দামোদরের দয়া হল। বললে, 'কোনো বৈষ্ণবের কাছে গিয়ে ভাগবত পড়ো। চৈতন্যচরণে শরণ নাও। ভক্তসঙ্গ করো। তা হলেই কৃষ্ণলীলা নির্মল করে বর্ণনা করতে পারবে। তবে অন্য ভাবে তোমার শ্লোকের একটা নির্দোষ ব্যাখ্যা হতে পারে।'

'কী?' বঙ্গকবি উৎসুক হল।

'কৃষ্ণ এক অদ্বয় তত্ত্ব—স্থাবর-ব্রহ্ম জগন্নাথ আর জঙ্গম-ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই দুই রূপে সংসারাসক্ত জড়বুদ্ধি জীবকে ত্রাণ করছেন।' বিশদ হল দামোদর: 'শ্রীকৃষ্ণ আত্মস্বরূপে এক তত্ত্ব, কিন্তু রূপে দুই। এক গতিশীল গৌরাঙ্গ আর এক স্থিতিশীল বিগ্রহ বা জগন্নাথ। গৌরাঙ্গ নীলাচলের বাইরে দেশে-দেশে গিয়ে বাইরে জঙ্গম-ব্রহ্ম হয়ে ত্রাণ করলেন আর যারা নীলাচলে এল তারা উদ্ধার পেল জগন্নাথদর্শনে। যাই হোক, নিন্দাচ্ছলে কৃষ্ণনাম করলেই যেখানে ভবক্ষয়, সেখানে তোমার অর্থও তোমাকে মুক্তি এনে দেবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

'কৃষ্ণে গালি দিতে করে নাম উচ্চারণ।
সেই নাম হয় তার মুক্তির কারণ॥'

॥ ৬৮ ॥

বাহ্যিক বৈরাগ্য ছেড়ে অনাসক্তভাবে সংসার করছে রঘুনাথ। শান্তিপুরে যখন মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা হয়, মহাপ্রভু বলে দিয়েছিলেন মর্কট বৈরাগ্য ছেড়ে নির্লিপ্ত হয়ে বিষয় ভোগ করো। বাইরে এমন কোনো আড়ম্বর দেখাবে না যে লোকে বুঝতে পারে ভিতরে তোমার বৈরাগ্য জন্মেছে। লোক-দেখানো বৈরাগ্যই মর্কট বৈরাগ্য। আর, বিষয়ী হয়ো না, 'বিষয়ীর মতন' হয়ো। অর্থাৎ বিষয়ে চোখ রাখো, মন রেখো না। মন শুধু চৈতন্যচরণে।

রঘুনাথের বাবা গোবর্ধন দাস, জেঠা হিরণ্য দাস। বিস্তীর্ণ সপ্তগ্রাম-মুলুকের জমিদার। নবাবের ঘরে বিপুল রাজস্ব দিয়ে বিরাট উপস্বত্ব ভোগ করছে। আর তাদের দানধ্যান পুণ্যকর্মই বা কত! যে ব্রাহ্মণ তাদের দান পায়নি, মুলুকে প্রবাদ, সে ব্রাহ্মণই নয়। বিষয় যদি না বাড়ে তবে দানই বা বড় হয় কী করে?

সেই বিষয়ীদের ছেলে রঘুনাথ আবার বিষয়কর্মে মন দিয়েছে, তাতে মা-বাপ সকলেই খুব খুশি।

ধনী হলেই তার শত্রু থাকবে। এক মুসলমান চৌধুরীর চোখ টাটাল। মুলুক থেকে আদায় বিশ লাখ, বারো লাখ রাজস্ব দিয়ে নীট আট লাখ ঘরে তোলে হিরণ্য-গোবর্ধন—দু' দু'টো হিন্দু—চৌধুরী জ্বলতে পুড়তে লাগল। নবাবের ঘরে গিয়ে নালিশ জানাল। কোনো কিছু খবর রাখেন? মুলুকের আদায় এখন বিশ লাখের অনেক বেশি। কিন্তু রাজস্ব সেই বারো লাখই আছে। আদায় যদি বেড়ে যায় তা হলে রাজার প্রাপ্য রাজস্বও কি বাড়বে না?

ঠিকই তো। তলব করো হিরণ্য-গোবর্ধনকে। ফরমান দিল নবাব।

'রাজাকে কম দিয়ে নিজেরা বেশি খাচ্ছ এ কেমনতরো কথা?' চোখ কষায়িত করল নবাব: 'রাজস্ব দ্বিগুণ করতে হবে।'

এ জুলুম, এ জবরদস্তি। হিরণ্য-গোবর্ধন মানল না ফরমান।

কুমিরের সঙ্গে বাদ করে জলে বাস করা অসম্ভব।

হিরণ্য-গোবর্ধনের জমিদারি নবাব বাজেয়াপ্ত করল আর দু' ভাইকে ধরে নিয়ে এসে জেলে পোরবার হুকুম দিলে।

নবাবের সৈন্য তাদের বাড়ি ঘিরল। কিন্তু কোথাও তাদের খুঁজে পেল না। দু' ভাই আগে ভাগেই সরে পড়েছে।

'তবে ছেলেটাকে ধরো।'

হিরণ্য-গোবর্ধনকে না পেয়ে রঘুনাথকে বেঁধে নিয়ে চলল।

'বল তোর বাপ-জেঠা কোথায়?' উজির হুমকে উঠল।

'তার আমি কী জানি।' নির্ভীক রঘুনাথ দাঁড়াল মুখোমুখি।

'কোথায় গেলে তাদের ঠিকানা পাওয়া যাবে?'

'তার আমি কী জানি?'

আমি শুধু জানি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শ্রীচরণ।

তর্জনে গর্জনে হবে না, উজির উৎপীড়নের ভয় দেখাতে লাগল। কিন্তু যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শ্রীচরণে আশ্রয় নিয়েছে তার আবার ভয় কী।

না, শুধু কথায় কাজ হবে না, সরাসরি প্রহার দরকার। প্রহারই বশীকরণের একমাত্র ওষুধ। মার খেলেই ছেলেটা অন্ধিসন্ধি সব বলে দেবে।

কিন্তু ছেলেটার মুখে কী জানি কী আছে, মারতে হাত ওঠে না। কেন কে জানে মনের মধ্যে কে ডাক দেয়, মারলে ভালো হবে না পরিণাম।

আর ছেলেটার কী মিষ্টি কথা। কী বিনয়নম্রতা। কণ্ঠস্বরেই মনের কাঠিন্য গলে যায়।

'কেন অপ্রতুল হচ্ছেন? বিষয় তো অতি সামান্য, এ তো নির্বিবাদেই মীমাংসা করে নেওয়া চলে।' অধিপতিকে রঘুনাথ বললে মধুস্বরে, 'আমার বাপ-জেঠা আপনারই ভায়ের মত। ভায়ে-ভায়ে সব জায়গায়ই ঝগড়া হয়, আবার মিটমাট হয়ে যায়। আমি যেমন আমার বাবার ছেলে তেমনি আপনারও ছেলে। আমার বাবা যদি আমার আবদার রাখেন, আপনিও বা রাখবেন না কেন?'

অধিপতির মন আর্দ্র হল। ছেড়ে দিল রঘুনাথকে।

বাপ-জেঠাকে নবাবের কাছে নিয়ে এল রঘুনাথ। কিছু রাজস্ব বেশি নাও আর জমিদারি ফেরত দাও।

মীমাংসা এত সহজ ছিল তা কে জানত। হিরণ্য-গোবর্ধন আবার তাদের পুরোনো স্বত্বে অধিষ্ঠিত হল।

কিন্তু এ কী উৎপাত!

রঘুনাথের প্রতি বাড়ির সকলের স্নেহমমতা প্রবলতর হয়ে উঠল। সন্দেহ কী, রঘুনাথের জন্যেই নবাবের রোষ নিবারিত হয়েছে, ফিরে এসেছে তালুক-মুলুক।

সংসারের সোনার শিকল রঘুনাথের সারা গায়ে কাঁটা হয়ে উঠল।

একদিন রাত্রে চুপি-চুপি পালাল ঘর ছেড়ে।

গোবর্ধন আবার তাকে ধরে আনল।

'ছেলে আমার পাগল হয়ে গিয়েছে,' বললে মা, 'ওকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখো।'

বিষণ্ণ মুখে গোবর্ধন বললে, 'দড়ির সাধ্য কী ওকে বাঁধে। অপ্সরার মত স্ত্রী, ইন্দ্রের মত ঐশ্বর্য ওকে বশ করতে পারল না। আর সত্য কথা বলতে কী, জন্মদাতা পিতাও পুত্রের প্রারব্ধ খণ্ডাতে অসমর্থ। পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে ওর যদি সংসারে বৈরাগ্য এসে থাকে, সে ফল কেউ পারবে না হরণ করতে।'

'তাই বলে যে পাগল, তাকে তুমি বেঁধে রাখবে না?'

'যে চৈতন্যচন্দ্রের জন্যে পাগল তাকে বাঁধবার দড়ি কই!'

'ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য স্ত্রী অপ্সরাসম।

এ সব বান্ধিতে যার নারিলেক মন।
দড়ির বন্ধনে তারে রাখিবে কেমতে?
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ ঘুচাইতে।
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হৈয়াছে ইহারে।
চৈতন্যচন্দ্রের বাতুল কে রাখিতে পারে?'

বারে-বারে পালাই, বারে-বারেই ধরা পড়ি কেন? নিজের চেষ্টায় কি চৈতন্যচন্দ্রের কাছে যেতে পারব না? তবে কি নিত্যানন্দের কৃপা দরকার? সংসারসমুদ্র পার করে চৈতন্যবন্দরে পৌঁছে দেবার ভেলাই কি নিত্যানন্দ?

নিত্যানন্দ পানিহাটিতে আছে, সেইখানে নিত্য নাম-উৎসব চলেছে, তার রঙ্গ একবার দেখে আসি।

'নিত্যানন্দ বলিতে হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়।
আউলায় সর্ব অঙ্গ, অশ্রু গঙ্গা বয়।'

বাবার কাছে যাবার অনুমতি চাইল।

'আবার ফিরে আসবে তো?' জিজ্ঞেস করল গোবর্ধন।

'আসব।'

নিত্যানন্দের গায়ে অনেক অলঙ্কার, তার কীর্তনের দলের সঙ্গে এক ডাকাত এসে জুটল। বর্ণে ব্রাহ্মণ কর্মে ডাকাত। মতলব, নিতাইয়ের গায়ের অলঙ্কার চুরি করে নেবে। নামরসে কত সময় বিবশ হয়ে থাকে, আলগোছে তুলে নিতে কতক্ষণ!

নবদ্বীপে হিরণ্যপণ্ডিতের বাড়িতে ভক্তগণ নিয়ে বিহার করছে নিতাই।

'এত দিনে আমাদের দুঃখ ঘুচল।' ব্রাহ্মণ ডাকাত বললে দলবলকে, 'মা-চণ্ডী এক ভাণ্ডেই সমস্ত অলঙ্কার জমা করে রেখেছেন। লোকজন বিশেষ নেই ধারে-কাছে, রাত একটু ঘন হয়ে এলেই হানা দেব। তোমরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি থাকো।'

রাত ঘন হয়ে আসতেই একজন চর পাঠাল, দেখে আয়, অবধূত কী করছে।

চর এসে খবর দিল, অবধূত খাচ্ছে।

আর তার লোকজন?

হৈ হৈ করছে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলছে। কেউ কেউ অট্ট অট্ট হাসছে, কেউ বা সিংহনাদ করছে।

করুক। কতক্ষণ করবে। একসময় না একসময় শোবে। ঘুমুবে। তখন গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব।

ততক্ষণ এই ঝোপে-জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে থাকি। অপেক্ষা করি।

কে কোন্ গয়নাটা নেবে ডাকাতের দল তারই ফিরিস্তি করতে বসল।

আস্তে আস্তে ডাকাতের দলই ঘুমিয়ে পড়ল। কী আশ্চর্য, রাত ভোর হয়ে গেল, তবু কারু চেতন নেই। কাকের ডাকে সবাই যখন জাগল, দেখল রাত কখন ধুয়ে-মুছে গেছে, কোথায় ডাকাতি করবে, কোন্ সাহসে?

ত্রস্তব্যস্ত হয়ে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ঝোপে-জঙ্গলে লুকিয়ে ফেলল ডাকাতেরা। একে-অন্যেকে গালি পাড়তে লাগল। তুই কেন আগে শুতে গেলি? তুই আর তা দেখলি কখন—তুই তো আগেই ঢলে পড়েছিস। যত দোষ তোর।

ব্রাহ্মণ-ডাকাত কলহ নিরস্ত করল। বললে, 'চণ্ডীর ইচ্ছায় হয়েছে। মাকে পুজো দিই নি মাকে আগে পুজো না দিলে ডাকাতি নিষ্ফল হয়। তা একদিন গেলেই সকল দিন যায় না।'

মদ্য মাংস নিয়ে চণ্ডীর পুজো করল ডাকাতেরা, তারপর মধ্যরাত্রে, নিতাই ও তার সঙ্গীরা যখন ঘুমিয়ে আছে, তখন বাড়ি ঘেরাও করতে গেল।

কিন্তু ও হরি, এ কী ভয়াবহ ব্যাপার! দেখল সশস্ত্র কতগুলি পাইক বাড়ি পাহারা দিচ্ছে। প্রত্যেকের প্রকাণ্ড চেহারা, প্রচণ্ড তেজ। আর আশ্চর্যের আশ্চর্য, সকলে উচ্চকণ্ঠে গাইছে কৃষ্ণনাম।

কী ব্যাপার? একটা সামান্য অবধূত এত সব পাইক বরকন্দাজ যোগাড় করল কোত্থেকে? আগে থেকে কী করে বা বুঝল যে ডাকাতি হবে, প্রহরীর প্রয়োজন? নিশ্চয়ই গুণ জানে।

'ও সব কিছু নয়।' দলপতি ব্রাহ্মণ বললে, 'বড় বড় লোকলস্কর মাঝে মাঝে আসে অবধূতকে দেখতে। তেমনি কেউ এসেছে আর ওরা তারই পাইক বরকন্দাজ। ভক্ত-ভাবুকের চাক'র করছে বলে মুখে ঐ কৃষ্ণ-কৃষ্ণ। যাই হোক, আজ আর নয়, দিন দশেক চুপচাপ থাকি, তারপর আবার একদিন দেখা যাবে।'

ক'দিন পর আবার একদিন মধ্যরাত্রে দেখতে গেল।

এবার আর দ্বিধা নয়, আক্রমণ করল সদলে। বাড়ির মধ্যে ঢুকতে না ঢুকতেই নিদারুণ অন্ধকার আচ্ছন্ন করল সকলকে। এ কী, চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না কেন? এ কী, সকলে অন্ধ হয়ে গেলাম নাকি?

চোখে কিছু ঠাহর করতে না পেরে সবাই এদিক-ওদিক ছিটকে পড়তে লাগল। কারু হাত ভাঙল, পা ভাঙল, কারু গায়ে-পায়ে কাঁটা ফুটল। অন্ধকারে কিছু দেখবার উপায় নেই, পোকা-মাকড় কামড়াতে লাগল সর্বাঙ্গে। আর, বিপাকের উপর দুর্বিপাক, তখুনি কি না নামল শিলাবৃষ্টি! অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যেতে লাগল। চোখে দেখতে পায় না, ভেবে পেল না কোথায়, কোন দিকে আশ্রয় নেবে। ত্রাসে মূর্ছা গেল অনেকে। কারু বা শীতে বৃষ্টিতে গায়ে জ্বর এসে পড়ল।

দস্যুপতি ব্রাহ্মণের তখন সম্বিৎ হল, নিত্যানন্দ ছাড়া আর গতি নেই, যার ধন কাড়তে এসেছি তার কৃপাই এখন কাড়তে হবে। আর, আমার মত পতিতজনের পক্ষে মহতের কৃপা ছাড়া আর ধন কী! পতিতজনকে উদ্ধার করবেন, তার দ্রোহকেও ক্ষমা দিয়ে আবৃত করবেন, তারই জন্যেই তো নিত্যানন্দ।

যে মাটিতে আছাড় পড়ে সে মাটিকে ধরেই আবার উঠে দাঁড়ায়। তুমিই ফেলেছ, তুমিই আবার তুলে ধরো।

নিত্যানন্দ-চরণ ধ্যান করলো ব্রাহ্মণ। চোখের দৃষ্টি খুলে গেল। দেখতে পেল পথ। সে পথ নিত্যানন্দ-চরণের দিকেই প্রসারিত।

নিত্যানন্দের পায়ে পড়ে ব্রাহ্মণ কাঁদতে লাগল।

'রক্ষ রক্ষ নিত্যানন্দ শ্রীবালগোপাল।
রক্ষা কর প্রভু তুমি সর্বজীবপাল॥
যে জন আছাড় প্রভু, পৃথিবীতে খায়।
পুনশ্চ পৃথিবী তারে হয়েন সহায়॥
এই মত যে তোমাতে অপরাধ করে।
শেষে সেহো তোমার স্মরণে দুঃখ তরে॥
তুমি সে জীবের ক্ষম সর্ব অপরাধ।
পতিতজনেরো তুমি করহ প্রসাদ॥'

বললে, 'পরহিংসা ছাড়া আমি আর কিছু জানতাম না, আমাকে দেখে সমস্ত নবদ্বীপ কাঁপত। সেই চণ্ডাল-আচার প্রচণ্ডকে বার বার তিনবার তুমি দস্যুতার থেকে নিবৃত্ত করলে। তবু হিংসা যায় না। শেষবার তুমি অন্ধ করে দিলে। বুঝলাম, সে অন্ধকারের কী যন্ত্রণা! তখন সমস্ত অন্ধের যে সহায় সেই ভক্তিকে স্মরণ করলাম। আর অমনি কিনা মুহূর্তে চোখ খুলে গেল। হল

লোচন-বিমোচন। তোমার প্রতি নির্দয় হতে চাইলাম আর তুমিই দয়া করলে। তবে আরো একটু দয়া দেখাও, অনুমতি করো, গঙ্গায় ডুবে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি।'

'নিরবধি নিত্যানন্দ চৈতন্য লওয়ায়।'

নিত্যানন্দ দস্যুপতিকেও চৈতন্য দান করল। বলল, 'তুমি ভাগ্যবন্ত, তোমার উপর পতিতপাবন চৈতন্য গোঁসাইয়ের কৃপা হয়েছে। তোমার সমস্ত পাতক আমিই মাথা পেতে নিলাম। তুমি সমস্ত অনাচার ছেড়ে দিয়ে ধর্মপথে চলে এস, তোমার দলবলকে সঙ্গে করে নিয়ে চলো, তা হলে আর তোমার ভয় নেই।'

নিতাইয়ের পাদপদ্মে দস্যু তার মাথা রাখল।

নিতাইই চৈতন্যহেতু। নিতাইই চৈতন্যসেতু।

রঘুনাথও বুঝল নিতাই না দরজা খুলে দিলে চৈতন্যগৃহে পৌঁছুনো যাবে না। তাই সে চলল নিতাই-সাক্ষাতে।

গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে উচ্চভূমিতে জ্যোতির্ময় দেহে নিত্যানন্দ ভক্তপরিবৃত হয়ে বসে আছে, রঘুনাথ এসে দণ্ডবৎ করল।

নিতাই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বললে, 'চোর! এত দিন পরে ধরা দিলে?'

চোর? চোর নয় তো কী! নিতাইয়ের সম্পত্তি গৌরচরণ যে নিতে চায় লুকিয়ে, যার সম্পত্তি তাকে না জানিয়ে, সে একশোবার চোর। চুরির যে চেষ্টা করে সেও চোর। কিন্তু চোর হয়েও সে প্রিয়, সে সুজন, সে মনোচোর।

নিজেই রঘুনাথের মাথা কাছে টেনে এনে পা রাখল নিতাই। বললে, 'যখন ধরতে পেরেছি তখন তোমাকে দণ্ড দেব।'

দণ্ড মাথা পেতে নেবার জন্যে বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়াল রঘুনাথ।

'আমাদের সকলকে দই-চিঁড়া খাওয়াও।'

এই দণ্ড!

মহানন্দে বাড়িতে খবর পাঠাল রঘুনাথ। প্রচুর অর্থ, দ্রব্যসম্ভার ও লোকজন আনাল। দিকে দিকে রাষ্ট্র করে দিলে পানিহাটিতে মহোৎসবের মেলা বসবে, যে যা পারো চিঁড়ে দই কলা চিনি ক্ষীর সন্দেশ নিয়ে এস, সব রঘুনাথ কিনে নেবে উচিত দামে। আর যেখানে যত ভক্ত আছে, সকলের নিমন্ত্রণ। যে আসবে সেই পরিপূর্ণ প্রসাদ পাবে। সর্বত্র অঢেল, ধনে জনে কুণ্ঠা নেই কোথাও। শুধু

চলে এস। উপস্থিত হও।

পার্ষদেরা অনেকে এসেছে। রামদাস, সুন্দরানন্দ, গদাধর, মুরারি, কমলাকর। আর এই যে সদাশিব কবিরাজ। পুরন্দর পণ্ডিত, ধনঞ্জয়, জগদীশ, পরমেশ্বর দাসও এসেছে। সবাই নাম-প্রেম-প্রচার-লীলার সঙ্গী। আর এসেছে গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস, মহেশ, উদ্ধারণ দত্ত। আরো কত শত, কে গোণে, কে হিসেব করে ?

তিন পঙক্তিতে খেতে বসেছে, বিশ জন পরিবেশন করছে, এমন সময় রাঘব পণ্ডিত এল।

রাঘবের বাড়িতেই তো নিতাইয়ের আড্ডা।

আর রাঘবের বিধবা বোন দময়ন্তীই তো প্রভুর জন্যে বারো মাসের ভোগ তৈরি করে ঝালি সাজিয়ে দিচ্ছে। যে সব জিনিস সদ্য নষ্ট হবার নয়, পাকের গুণে এক বছর স্থায়ী হবে সেই সব জিনিস। মকরধ্বজ করের জিম্মায় সে ঝালি প্রতি বছর পৌঁছুচ্ছে নীলাচলে। তাই তার নাম 'রাঘবের ঝালি'।

রাঘবকে দেখে নিতাই বললে, 'আমি গোপদের নিয়ে পুলিনভোজন বসেছি। তুমিও বসে যাও।'

এ কি বলরামের ভাবে কথা কইছে নিতাই ? সেই যে রাখালদের নিয়ে কৃষ্ণ-বলরাম যমুনাপুলিনে ভোজন করেছিল এ কি সেই স্মৃতি ? তবে কৃষ্ণ কোথায় ?

নিতাই মহাপ্রভুর ধ্যান করল, আর অমনি মহাপ্রভু আবির্ভূত হলেন।

নিতাই মহাপ্রভুকে নিয়ে মণ্ডলে মণ্ডলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু সবাই নিতাইকেই দেখছে, মহাপ্রভুকে দেখছে না। আর প্রত্যেকের মালসা থেকে এক এক গ্রাস চিঁড়ে নিয়ে তাঁরা যে পরস্পরকে খাইয়ে দিচ্ছেন তাও বা কে দেখে !

নিজের পাশে আসন পাতল নিতাই। সে আসনে নিমাই বসল। দু'ভাই চিঁড়ে খেতে লাগল।

এমন দৃশ্যও দেখে কোন ভাগ্যবান ?

'হরি-হরি ধ্বনি তোলো।' আদেশ করল নিত্যানন্দ।

সন্দেহ কী, রঘুনাথের প্রতি এ নিতাইয়ের অকৃপণ কৃপা। শুধু তার সামগ্রীই অঙ্গীকার করল না, মহাপ্রভুকে উৎসবে টেনে নিয়ে এল। তার অর্থই রঘুনাথকে নিতাই চৈতন্যচরণ দান করলে।

রঘুনাথ কোথায় ? সে বুঝি বসে নি।

না, সে বসবে কেন ? নিত্যানন্দই তাকে বসতে দেয় নি। নিত্যানন্দ যে

তাকে মহাপ্রভুর ভুক্তাবশেষ প্রসাদ খাওয়াবে।

রঘুনাথ জানল এ বুঝি নিত্যানন্দের প্রসাদ। নিত্যানন্দের প্রসাদই তো মহাপ্রভুর করুণার আস্বাদ দিয়ে ভরা।

তারপরে দিনশেষে রাঘবমন্দিরে কীর্তন আরম্ভ হল। নিত্যানন্দ নাচতে লাগল। মহাপ্রভু চলে এলেন সেই নাচ দেখতে। কিন্তু নিত্যানন্দ ছাড়া মহাপ্রভুকে কে দেখে?

না, রাঘবও বুঝি দেখল। যখন নিমাই খেতে বসে তার ডান পাশে আরেকখানা আসন পাতা।

'সে কী, ওখানে কে বসবে?'

রাঘব বিস্ময়বিহ্বল চোখে চেয়ে দেখল এ যে স্বয়ং মহাপ্রভু।

রাঘবের ঘরে রাধারমণ প্রতিষ্ঠিত, আর তার প্রসাদ অমৃতের সার যেহেতু অপ্রকাশ্যে স্বয়ং রাধাঠাকুরাণীই সে-ভোগ রান্না করে। মহাপ্রভু যে বারে বারে সে প্রসাদ খেতে আসবে তাতে আর আশ্চর্য কী। আর যে ভক্ত নিত্য নিয়মিত এমন অমৃত ভোজন করায় তাকে মাঝে-মধ্যে দেখা দিতে দোষ নেই।

দুই ভাইয়ের অবশিষ্ট-পাত্র রঘুনাথকে উপহার দিল রাঘব। বললে, 'তুমি চৈতন্য গোঁসাইয়ের প্রসাদ পেলে, তোমার সর্ব বন্ধন খণ্ডন হল।'

'কোথায় চৈতন্য গোঁসাই?' ব্যাকুল হল রঘুনাথ।

'তিনি নীলাচলে। তিনি আবার ভক্তচিত্তে ভক্তগৃহে। তিনি কখনো ব্যক্ত কখনো গুপ্ত। তিনি যে স্বতন্ত্র ভগবান। কখনো মানুষের মত হাঁটেন, কখনো ভগবানের মত আবির্ভূত হন। তিনি সর্বব্যাপী, তাঁর ইচ্ছায় তাঁর গতি-স্থিতি। সংশয় করতে যেও না, সংশয়েই সর্বনাশ।'

'না, সংশয় করি না কিন্তু তিনি না আসুন, আমি তাঁর কাছে যাব কী করে?' রঘুনাথ এবার নিতাইয়ের পা আঁকড়ে ধরল। বললে, 'কিন্তু চাঁদ যদি নিজে থেকে নেমে না আসে বামনই বা তাকে ধরে কী করে? যতবার গৃহ ছেড়ে পালাতে যাই ধরা পড়ি, মা-বাবা কঠোর শাসনে বেঁধে রাখে। আমি আর কিছু চাই না, শুধু চৈতন্য চাই, যেন কেউ আমাকে বাঁধতে না পারে, বন্ধনহীনতার চৈতন্য। তোমার কৃপা ছাড়া চৈতন্য অলভ্য, তুমি আমাকে কৃপা করো। জানি আমি অযোগ্য, কিন্তু অযোগ্য-অকৃতীরই তো কৃপালাভে অধিকার।'

'অযোগ্য মুঞি, নিবেদন করিতে করোঁ ভয়।

মোরে চৈতন্য দেহ গোঁসাই, হইয়া সদয়।
মোর শিরে পদ ধরি করহ প্রসাদ।
নির্বিঘ্নে চৈতন্য পাও, কর আশীর্বাদ॥'

নিতাই ভক্তবৈষ্ণবদের বললে, 'তোমরা সব দেখ, এর ইন্দ্রসুখের মত বিষয়সুখ, কিন্তু চৈতন্যকৃপায় এতে এর রুচি নেই। যে একবার কৃষ্ণপাদপদ্মের গন্ধ পায় ব্রহ্মলোকের সুখও সে অগ্রাহ্য করে।'

'কৃষ্ণ পাদপদ্ম গন্ধ যেই জন পায়।
ব্রহ্মলোক-আদি সুখ তারে নাহি ভায়॥'

তাকাল রঘুনাথের দিকে। সস্নেহে বললে, 'তোমার পুলিনভোজনে চৈতন্য এসেছিলেন, খেয়ে গেলেন দই-চিঁড়া। রাত্রে নাচ দেখতে এসে রাধারাণীর রান্না খেয়ে গেলেন। তুমি দুবারই তাঁর প্রসাদ পেলে। এ সব কেন? তোমাকে উদ্ধার করতেই এই আয়োজন। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি ফিরে যাও। গৌরাঙ্গ নেবেন তোমাকে তাঁর অন্তরঙ্গ ভৃত্য করে।'

তবে আর কথা কী! নিত্যানন্দের সেবার জন্যে ভাণ্ডারীর হাতে রঘুনাথ কিছু অর্থ আর সোনা দিল গোপনে। বললে, 'এখন নয়, প্রভু যখন নিজঘরে যাবেন তখন বলবে।' আর শুধু প্রভুকে নয়, প্রভুর ভৃত্য ও আশ্রিত সর্বজনকেই আমি সেবা-প্রণাম জানাতে চাই।

রাঘব প্রকাণ্ড ফর্দ তৈরি করল। আর যাকে যা বলল তাই রঘুনাথ দিল নির্বিচারে।

'আর এই সামান্য আপনার জন্যে।' রঘুনাথ রাঘবকেও দিল টাকা আর সোনা। সকলের আশীর্বাদ মাথায় করে বাড়ি ফিরল রঘুনাথ।

বাবার কাছে দেওয়া কথা রাখল। এখন দেখি নিত্যানন্দ কেমন তাঁর কথা রাখেন। কেমন গৌরহরি তাকে টেনে নেন অন্তরঙ্গ করে।

॥ ৬৯ ॥

রঘুনাথ আর অন্দরমহলে যায় না, বাইরে দুর্গামণ্ডপে পড়ে থাকে। সেইখানেই প্রহরীরা পাহারা দেয়। আর রঘুনাথ একান্তে ভাবে কবে আসবে সেই সুবর্ণসুযোগ।

গৌড়ের গৌরভক্তরা নীলাচলে চলেছে, তাদের সঙ্গ ধরা কত সহজ হত। কিন্তু তাদের পথ সকলের জানা, প্রহরীরা ঠিক ধরে আনত তাকে। এমন সুযোগ কি আসে না যখন অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে অজানা পথ দিয়ে চলে যাওয়া যায়?

চারদণ্ড রাত্রি বাকি আছে, একদিন মণ্ডপে যদুনন্দন আচার্য এসে হাজির। যদুনন্দন রঘুনাথদের কুল-পুরোহিত, দীক্ষাগুরু অদ্বৈত প্রভুর মন্ত্রশিষ্য।

রঘুনাথের ঘুম ভেঙে গেল। যদুনাথকে দণ্ডবৎ করে দাঁড়াল নীরবে।

'আমার যে পূজুরী ছিল সে আর পূজো করতে আসছে না।' বললে যদুনন্দন, 'তুমি যদি তাকে বলে-কয়ে পাঠিয়ে দিতে পারো তবে ভালো হয়। সে ছাড়া আর ব্রাহ্মণ নেই।'

রঘুনাথ প্রহরীদের দিকে তাকাল। তারা সুখনিদ্রায় অচেতন।

রঘুনাথ বললে, 'বেশ তো, আমাকে আজ্ঞা করুন, আমি যাই।'

যদুনাথ ভাবলে, প্রহরী ছাড়া একাকী যাবারই অনুমতি চাইছে রঘুনাথ। বললে, 'যাও।'

রঘুনাথ গুরু আজ্ঞায় আবৃত, নিশ্চিন্তে বেরিয়ে পড়ল। যদুনাথ কল্পনাও করতে পারল না, এই ছলনার সুযোগ নিয়ে রঘুনাথ নীলাচলে পালাবে।

প্রভুই তো শান্তিপুরে রঘুনাথকে বলেছিলেন, 'এখন ঘরে ফিরে যাও, অনিপুণ হয়ে বিষয়কর্ম করো। আমি ইতিমধ্যে নীলাচল থেকে ফিরে আসি, তারপর কোনো ছলে তুমি আমার কাছে এসে হাজির হও। ভয় নেই, কৃষ্ণই সেই ছল রচনা করে দেবেন।'

ছলে বলে কৌশলে যে করে হোক পৌঁছুনো নিয়ে কথা।

পথ ছেড়ে উপপথ ধরল রঘুনাথ। গ্রাম ছেড়ে বনজঙ্গল। পথ যাই হোক, গন্তব্য চৈতন্যচরণ। গোপন পথ হলেও, পাছে প্রহরীরা ধরে ফেলে, ছুটে চলেছে। ভয় নয় না, ছুটেছে ঊর্ধ্বশ্বাসে।

রঘুনাথ পালিয়েছে, রঘুনাথকে পাওয়া যাচ্ছে না—এদিকে রব উঠেছে বাড়িতে। খবর পেয়ে যদুনন্দন তো হতবাক। গোবর্ধন পাগলের মত হয়ে গিয়েছে। নিশ্চয়ই নীলাচলের পথে গৌড়ের ভক্তদের সঙ্গে ভিড়েছে। শিবানন্দকে পত্র দিয়ে লোক পাঠাল গোবর্ধন। দয়া করো, আমার ছেলেকে ফেরত পাঠিয়ে দাও।

ওদিকে পনেরো ক্রোশ হেঁটে সন্ধ্যাকালে এক গোয়ালার বাথানে এসে পৌঁচেছে রঘুনাথ।

'চোখমুখ শুকনো, সারাদিন কিছু খাও নি মনে হচ্ছে।' জিজ্ঞেস করল গোয়ালা, 'দুধ খাবে?'

রঘুনাথ হাসল।

গোয়ালা দুধ এনে দিল। তাই খেয়ে সারারাত বাথানে পড়ে রইল রঘুনাথ।

ভোরে উঠে, এতক্ষণ পুব দিকে যাচ্ছিল, রঘুনাথ দক্ষিণ দিকে চলল।

শিবানন্দের কাছে পত্র পৌঁছুল। কোথায় রঘুনাথ। কই আমাদের সঙ্গে আসে নি তো। কাকে ফেরাব?

গোবর্ধনের লোকই ফিরে চলল।

আর ওদিকে রঘুনাথ সমানে হাঁটছে, হেঁটে চলেছে। কখনো চর্বণ, কখনো রন্ধন, কখনো দুগ্ধপান, কখনো বা নিরম্বু উপবাস। জীবনের অহোরাত্রের ক্ষুধা—একমাত্র চৈতন্যচরণ। সে ক্ষুধার নিবৃত্তি হবে কবে?

বারো দিন পরে—বারো দিনের মধ্যে তিন দিন শুধু ভোজন হয়েছে—রঘুনাথ পুরুষোত্তমে পৌঁছুল।

'এই যে রঘুনাথ এসেছে।' উছলে উঠল রঘুনাথ।

'এসেছ? এস।' প্রভু উঠে রঘুনাথকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, 'কৃষ্ণ-কৃপা সবচেয়ে বলিষ্ঠ। তোমাকে বিষয়কূপ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এল।'

রঘুনাথ বললে, 'আমি কৃষ্ণ জানি না, আমি শুধু তোমাকে জানি। তোমার কৃপাই আমাকে নিয়ে এল এখানে।'

'এর বাপ আর জেঠা', সকলকে লক্ষ্য করে বললেন প্রভু, 'বিষয়বিষকেই সুখ-সেব্য বলে মনে করে। এদের অনেক দান-ধ্যান, কিন্তু এদের কৃষ্ণকামনা নেই, নেই বা অনন্য কৃষ্ণভক্তি। বিষয়ের এমনি স্বভাব, মানুষকে অন্ধ করে রাখে, এমন কর্ম করায় যাতে ভববন্ধন আরো দৃঢ় হয়। তোমাকে সেই বিষয় থেকে কৃষ্ণ উদ্ধার করে নিয়ে এলেন। কিন্তু দেখেছ, ছেলেটার শরীর কি রকম কৃশ হয়ে গেছে, মুখখানি ম্লান। স্বরূপ, তুমি এর ভার নাও, একে তুমি তোমার ছত্র-ভৃত্য-রূপে অঙ্গীকার করো। আজ থেকে এর নাম হল, 'স্বরূপের রঘুনাথ।' বলে রঘুনাথের হাত ধরে স্বরূপের হাতে তুলে দিলেন।

স্বরূপ বললে, 'তাই হবে।'

প্রভু তারপর গোবিন্দকে বললেন, 'কতদিন উপবাসে থেকেছে, তুমি ভালো করে খাইয়ে এর তৃপ্তিবিধান করো।' রঘুনাথকে লক্ষ্য করলেন: 'তুমি যাও, সমুদ্রস্নান সেরে জগন্নাথকে দর্শন করে এস।'

পাঁচদিন গোবিন্দের তত্ত্বাবধানে রইল রঘুনাথ। প্রভুর অবশেষপাত্র খেল পেট ভরে। ভাবল, এও তো সেই বাড়ির মত আদর যত্নেই আছি, দিব্যি মুখের কাছে অনায়াসে খাবার এসে জুটেছে। তবে তো সেই আত্মসুখস্পৃহাতেই আবদ্ধ রইলাম। না, ফিরিয়ে দিল গদাধরকে, বললে, 'ভিক্ষে করে খাব।'

ভিক্ষার্থী হয়ে মন্দিরের সিংহদ্বারে এসে দাঁড়াল রঘুনাথ। যদি কিছু জোটে খাব, না জোটে তো থাকব উপোস করে। আর সর্বক্ষণ নামকীর্তন করব।

গোবিন্দ প্রভুকে গিয়ে বললে, 'রঘুনাথ আর খাচ্ছে না আমার থেকে। সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা মেগে খাচ্ছে।'

এই তো নিষ্কিঞ্চন বৈরাগীর লক্ষণ। প্রভু বললে, 'বা, খুব ভালো করছে।'

যে বৈরাগী সে অবিচ্ছেদে নামকীর্তন করবে। আহারের জন্যে উদ্বিগ্ন হবে না, সঞ্চয়-সংস্থান কিছু করবে না। ভিক্ষে করে যেটুকু পায় তা দিয়েই দেহরক্ষা করবে, দেহরক্ষা না হলে ভজনকীর্তন হবে কিসে? ভিক্ষান্নই অহঙ্কারমুক্ত, ভিক্ষান্নেই কৃষ্ণপ্রেমের স্বাদগন্ধ।

'বৈরাগী করব সদা নামসঙ্কীর্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন রক্ষণ॥
বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য সাধে নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায় তার, হয় রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য—সদা নামসঙ্কীর্তন।
শাকপত্র ফলমূলে উদর-ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥'

একদিন স্বরূপকে ধরল রঘুনাথ বললে, 'বলুন আমার কী কর্তব্য। প্রভু আমাকে ঘর ছাড়িয়ে নিয়ে এলেন, তাঁর উদ্দেশ্য কী?

প্রভুকে বিশেষ সম্ভ্রম করে, তাই সরাসরি তাঁকে প্রশ্ন করতে সঙ্কোচ হয়। স্বরূপকে দিয়ে বলে পাঠাল। স্বরূপ বললে, 'রঘুনাথ জানতে চেয়েছে কী তার করণীয়।'

রঘুনাথকে ডেকে পাঠালেন প্রভু। বললেন, 'স্বরূপকে তোমার উপদেষ্টা করে দিয়েছি, ওর কাছ থেকে সাধ্যসাধনতত্ত্ব শিখে নাও। ও যত জানে আমার তত

জানা নেই। তবু আমার বাক্যে যদি তোমার শ্রদ্ধা থাকে, তোমাকে বলি, কখনো গ্রাম্যবার্তা শুনবে না, কখনো বলবেও না। ভালো খাবার-পরবার লোভ করবে না। অমানীমানদ হয়ে সর্বদা কৃষ্ণনাম নেবে আর মানসব্রজে রাধাকৃষ্ণের সেবা করবে। আমি সংক্ষেপে বললাম, বিশদ-বিশেষ জেনে নেবে স্বরূপের থেকে।'

'গ্রাম্যবার্তা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানীমানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা মানসে করিবে॥'

গৌড়ভক্তেরা এসে পড়েছে, পূর্ববৎ শুরু হল আনন্দলীলা।

শিবানন্দ রঘুনাথকে বললে, 'তোমার বাবা তোমার সন্ধানে লোক পাঠিয়েছিল, আমরা তাদের ফিরিয়ে দিলাম। বললাম, রঘুনাথ আমাদের সঙ্গে আসে নি। কোথায় আছে কী করে বলব। তুমি যে আগে থেকেই এখানে চলে এসেছ তা কে জানে?'

উৎসবান্তে, চার মাস পরে, গৌরভক্তেরা গৌড়ে ফিরে এল। তাদের কাছে যদি খবর পাওয়া যায় সেই আশায় শিবানন্দের কাছে লোক পাঠাল গোবর্ধন।

'গোবর্ধনের ছেলে রঘুনাথকে কি নীলাচলে দেখলেন?'

'দেখলাম বৈ কি। প্রভু তাকে স্বরূপের হাতে সমর্পণ করে দিয়েছেন।'

'সে কি বাড়ি ফিরবে?'

'মনে হয় না।' বললে শিবানন্দ, 'তাকে বৈরাগ্য আচ্ছন্ন করেছে। তার ভক্ষ্যে পরিধানে দৃষ্টি নেই। দশদণ্ড রাত্রি গেলে পুষ্পাঞ্জলির পর সে সিংহদ্বারে এসে দাঁড়ায়, যদি কেউ ভিক্ষে দেয় তো খায়, না দেয় তো খায় না, উপোস করে থাকে।'

গোবর্ধন শুনল সব বিবরণ। বেঁচে আছে এতে তার আনন্দ, কিন্তু আর যে ফিরবে না এটাই দুর্বিষহ যন্ত্রণা।

ছেলের পরিচর্যার জন্যে চাকর আর টাকা পাঠাতে মনস্থ করল গোবর্ধন। শিবানন্দ বললে, 'এখন কোথায় যাবে, কার কাছে পৌঁছুবে ঠিক নেই। এখন থাক, পরের বছর আমি যখন যাব তখন সঙ্গে দিয়ে দেবেন।'

তাই ভালো। পরের বছর গৌড়ভক্তরা যখন যাচ্ছে তখন শিবানন্দের সঙ্গে গোবর্ধন লোক আর টাকা পাঠিয়ে দিল। লোক বলতে দুই চাকর, এক ব্রাহ্মণ,

আর টাকা চায় শো মুদ্রা।

যথারীতি পৌঁছুল সকলে নীলাচলে। রঘুনাথের সাক্ষাৎ পেল। এই নাও, এই সব আরাম-সম্ভার তোমার বাবা তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

রঘুনাথ সমস্ত অগ্রাহ্য করে দিল।

ব্রাহ্মণ আর ভৃত্য দেশে ফিরল না, নীলাচলেই অপেক্ষা করতে লাগল।

রঘুনাথ ভাবল, তবে এক কাজ করি। বাবার দেওয়া টাকা থেকে মহাপ্রভুকে মাসে দু'দিন মহাপ্রসাদ খাওয়াই।

গৌরহরি নিমন্ত্রণ নিতে রাজি হলেন। মাসে দু'দিন।

দু'দিনের মহাপ্রসাদ কিনতে আটপণ মাত্র কড়ি লাগে। সেই মাত্র আটপণ কড়িই রঘুনাথ বাবার ভৃত্যদের কাছ থেকে চেয়ে নেয়। কদাচ এক কড়ি বেশি নয়। অর্থাৎ এক কপর্দকও নিজের জন্যে নয়। যেটুকু প্রয়োজন শুধু সেইটুকু, তাও প্রভুর জন্যে। তাও এক মাসে আট গণ্ডা।

টানা দু'বছর এ ভাবে প্রভুর সেবা করল রঘুনাথ।

তারপর হঠাৎ একদিন নিমন্ত্রণ বন্ধ করে দিল।

'কী ব্যাপার?' স্বরূপকে জিজ্ঞেস করলেন প্রভু, 'রঘুনাথ নিমন্ত্রণ বন্ধ করল কেন?'

স্বরূপ বললে, 'রঘুনাথের মনে একটি বিচার উপস্থিত হয়েছে, তাই বন্ধ করেছে নিমন্ত্রণ।'

'কী বিচার?'

'বিষয়ীর দ্রব্য দিয়ে প্রভুকে সেবা করাচ্ছ এতে প্রভুর মন নিশ্চয়ই প্রসন্ন নয়। এতে আত্মপ্রতিষ্ঠা ছাড়া আর তো কোনোই ফল দেখছি না। রঘুনাথ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করে মহাপ্রসাদ দিচ্ছে—শুধু এই অহঙ্কার দিয়ে কী হবে? আমার প্রার্থনা না মানলে আমি দুঃখ পাব তারই জন্যে প্রভু নিমন্ত্রণ নিতে রাজি হয়েছিলেন—কিন্তু এতে তাঁরও প্রসন্নতা নেই আর আমার মনও মালিন্যময়।'

প্রভু হাসলেন। বললেন, 'বিষয়ীর অন্ন খেলে মন মলিন হয়। আর মলিনচিত্তে কৃষ্ণস্মৃতি স্ফুরিত হয় না। বিষয়ীর হচ্ছে রাজসনিমন্ত্রণ। দম্ভ আর প্রতিষ্ঠা লোভই এই নিমন্ত্রণের হেতু। এতে দাতা-ভোক্তা দুয়েরই সঙ্কোচ ঘটে। আমি যে এতদিন রঘুনাথের নিমন্ত্রণ নিয়েছি তার কারণ ওকে দুঃখ দিতে চাই নি। ও যে নিজের থেকে বুঝেছে, নিজের ইচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছে, এই আমার আনন্দ।'

রঘুনাথ তারপর সিংহদ্বারও ছেড়ে দিল, ছত্রে গিয়ে ভিক্ষে করতে লাগল।

'হ্যাঁ হে, রঘুনাথ নাকি ভিক্ষের জন্যে আর সিংহদ্বারে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে না?' প্রভু জিজ্ঞেস করলেন স্বরূপকে।

'কে দেবে, কে না দেবে, এই আশা-নিরাশায় চিত্ত চঞ্চল হয়ে থাকে বলে দাঁড়ানো ছেড়ে দিয়েছে।'

'ঠিক করেছে।' প্রভু সমর্থন করলেন: 'সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যাচার ছাড়া কিছু নয়। ছত্রে যথালাভ উদরভরণ অনেক ভালো। সেখানে আর মনে-মনে আশায়-নিরাশায় আন্দোলিত হওয়া নেই, তদ্‌গত মনে মুখে কৃষ্ণকীর্তন করতে পারবে। স্বরূপ, এই শিলা আর মালা নিয়ে যাও, রঘুনাথকে দিও।'

শঙ্করারণ্য সরস্বতী গোবর্ধনের শিলা আর গুঞ্জামালা নিয়ে এসেছিল বৃন্দাবন থেকে। প্রভুকে উপহার দিয়েছিল। লীলাসম্বরণের সময়ে ঐ মালা প্রভু গলায় পরতেন আর ঐ শিলা কখনো মাথায় ধরতেন, কখনো বুকে, কখনো তার ঘ্রাণ নিতেন আর কখনো একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে চোখের জলে তাকে স্নান করিয়ে দিতেন। এ তো সামান্য শিলা নয়, এ আমার কৃষ্ণকলেবর। এতদিন বহুর এই শিলামালা ধারণ করেছেন, আজ তা রঘুনাথকে দিয়ে দিলেন।'

বললেন, 'রঘুনাথ, এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ, এর তুমি সাত্ত্বিক পূজো করো। একপাত্র জল নাও আর নাও আটটি তুলসীমঞ্জরী, তাই দিয়ে তুমি শুদ্ধভাবে, শ্রদ্ধায়, নিবেদন করো শিলাকে, তুমি অচিরেই কৃষ্ণপ্রেমধন পেয়ে যাবে।'

স্বরূপই সব যোগাড় করে দিল। শিলা বসাবার জন্যে একখানি পিঁড়ি, আচ্ছাদনের আধ হাত বস্ত্র আর জলের জন্যে একটি কুঁজো।

প্রাণ-মন ঢেলে পূজো করতে লাগল রঘুনাথ। এ আর কেউ নয়, প্রভুর স্বহস্তদত্ত গোবর্ধন-শিলা। যতই প্রভুর এই করুণার কথা ভাবে ততই রঘুনাথ প্রেমাশ্রুতে ভেসে যায়। এই জল-তুলসীর পূজায় যত সুখ তত সুখ তো সাড়ম্বর ষোড়শোপচার পূজায় নেই। আর এ শিলা কোথায়, স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন এসে দাঁড়িয়েছে।

স্বরূপ বললে, 'আট কড়ির খাজা সন্দেশ নিবেদন করো শিলাকে। যদি শ্রদ্ধা করে দাও সেই খাজা সন্দেশই অমৃতের সমান হয়ে উঠবে।'

স্বরূপের আদেশে গোবিন্দই নিয়ে আসছে সেই খাজা সন্দেশ। রাজৈশ্বর্যে পালিত রঘুনাথ সর্বস্ব-ত্যাগের পরমদৈন্যে সেই খাজা সন্দেশ দিয়েই বিগ্রহের ভোগ দিচ্ছে।

আর শুধু কৃষ্ণ কোথায়? সঙ্গে যে রাধাঠাকুরাণী।

শিলা দিয়ে প্রভু আমাকে গিরিগোবর্ধনের চরণে সমর্পণ করলেন আর গুঞ্জামালা দিয়ে রাধিকার চরণে। প্রভু তাই যুগলকিশোরেরই ভজনা করতে বলছেন।

আনন্দে রঘুনাথের বাহ্যবিস্মরণ হল। প্রভুই তো আমার যুগলকিশোর!

কী কঠিন নিয়মে বন্দী রঘুনাথ। কোথাও এতটুকু সময়ভঙ্গ নেই, নেই ছন্দচ্যুতি। 'রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা।' পাষাণের রেখা যেমন নিটুট তেমনি রঘুনাথের নিয়মনিষ্ঠাও অভঙ্গ। দিন রাত্রির আট প্রহরের মধ্যে সাড়ে সাত প্রহরই সে ভজন করে, আহার ও ঘুমের জন্যে বরাদ্দ মোটে চার দণ্ড। কোনো কোনো দিন ভজন-আবেশে সে এত তন্ময় হয়ে যায়, আহার-নিদ্রার অবকাশই থাকে না।

জিহ্বাকে কোনো দিন রসস্পর্শ দিল না, ছেঁড়া কাঁথা-কাঁনি ছাড়া কিছু ঠেকাল না গায়ে, আর আহার শুধু প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে। ভালো না-খাওয়া আর ভালো না-পরার আদেশ রাখল প্রাণপণে। আর সর্বক্ষণই নিজেকে নির্বেদ-বচন শোনাচ্ছে। হায়, আমি দারুণ হতভাগ্য, আমি নিজের স্বরূপ ভুলে দেহে আত্মবুদ্ধি পোষণ করছি। এখনো আমি ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করছি, এখনো আমার অন্নবস্ত্রের প্রয়োজন! ঘুরে ফিরে আমারও এখন সেই আত্মসেবা!

যে জ্ঞানধৃতাশয়, অর্থাৎ জ্ঞানবলে যার বাসনা নাশ হয়েছে, যে নিজেকে দেহ থেকে ভিন্ন বলে জেনেছে, সে কিসের আশায় কোন অভিসন্ধিতে দেহে আসক্ত হয়ে দেহকে পোষণ করে বেড়াবে?

কয়েকদিন পরে রঘুনাথ ছত্রে গিয়ে মেগে খাওয়াও ছেড়ে দিল। এতেও পরাপেক্ষা আছে। কতক্ষণে ছত্রের মালিক বা মালিকের কর্মচারী ভিক্ষান্ন নিয়ে আসে তারই জন্যে থাকতে হয় উৎকণ্ঠিত হয়ে। সুতরাং সেই চাঞ্চল্যভোগও বিসর্জন দাও।

রঘুনাথ ফেলে-দেওয়া বাসি পচা প্রসাদান্ন খেতে লাগল কুড়িয়ে।

আনন্দবাজারে প্রসাদান্ন সমস্তই রোজ বিক্রি হয় না। বাসি অন্নও থেকে যায় কিছু-কিছু। দু'-তিন দিনের বাসি হয়ে গেলে সে অন্ন আর কেউ কেনে না। তখন সে পচা দুর্গন্ধ অন্ন গরুর সামনে ফেলে দেয়। অনেক সময় অন্নের এমন দুরবস্থা, গরুও তা মুখে তোলে না। সেই গলিত প্রসাদান্নই রঘুনাথ মাটি থেকে ঘরে তুলে নিয়ে আসে, জল দিয়ে ধুয়ে গলিতাংশ বাদ দিয়ে শক্ত

শক্ত ভাত ক'টি নুন মেখে খায়।

প্রসাদ কি কখনো পচে, না, দুর্গন্ধ হয়! প্রসাদ তো চিদবস্তু। সে বাসিও হয় না, বিকৃতও হয় না। সে চিরন্তন অমৃতস্বরূপ হয়ে থাকে। আগুন কি কখনো ঠাণ্ডা হয়? তুষার কি কখনো উষ্ণ হয়? তেমনি প্রসাদও তার ধর্ম ছাড়ে না, সে চিরকাল অবিকৃত থাকে। প্রাকৃত লোকের দৃষ্টিবিচারেই প্রসাদকে বাসি দেখায়, গলিত দেখায়। প্রাকৃত চক্ষুতে চিন্ময় ভগবদবিগ্রহকেও যেমন দেখায় সামান্য প্রতিমা। চিন্ময় বৃন্দাবনকে সামান্য তীর্থ। তাই প্রাকৃত জনের কাছে যাই হোক, রঘুনাথের কাছে এ প্রসাদ বাসিও নয়, বিকৃতও নয়—অপূর্ব সাত্ত্বিক সম্পদ।

একদিন স্বরূপ দেখতে পেল রঘুনাথের প্রসাদ খাওয়া।

'বা, আমাকে কিছু দাও।' স্বরূপ হাত বাড়াল। খেয়ে বললে, 'তুমি রোজ-রোজ এই অমৃত খাও, আমাদের দাও না কেন? এ তোমার কেমন স্বভাব?'

গোবিন্দের কাছ থেকে প্রভুও জানতে পেলেন।

'সে কী?' নিজেই চলে এলেন রঘুনাথের কাছে: 'নিজেরা লুকিয়ে লুকিয়ে খাচ্ছ, আমাকে ভাগ দিচ্ছ না কেন?' বলেই ত্বরিতে একগ্রাস মুখে পুরলেন।

আরো এক গ্রাস নেবার জন্যে হাত বাড়িয়েছেন, স্বরূপ বাধা দিল। বললে, 'না, এ তোমার যোগ্য নয়।'

প্রভু বললেন, 'কী যে বলো তার অর্থ নেই। কত প্রসাদ পেয়েছি এমন সুস্বাদু প্রসাদ আর কখনো খাই নি।'

রঘুনাথের বৈরাগ্যে প্রভুর অশেষ সন্তোষ।

আমি কুজন, পতিত ও ঘৃণিত, গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু গ্রন্থে বলছে রঘুনাথ, তবু আমাকে যিনি ভোগসুখের দাবানল থেকে কৃপা করে উদ্ধার করলেন, নিজের বুকের প্রিয় গুঞ্জাহার আর গোবর্ধনশিলা দিয়ে দিলেন উপহার, সঁপে দিলেন স্বরূপগোস্বামীর হাতে, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে আনন্দময় হয়ে বিরাজ করুন।

রঘুনাথ আর কী করে? রাত্রিকালে সকলের অগোচরে প্রভুর পদসেবা করে, লীলাবেশে প্রভু যখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হন তখন করে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ। ষোল বছর সমানে সে এই অন্তরঙ্গ সেবা করে এসেছে। স্বরূপের অন্তর্ধানে হলে বৃন্দাবন চলে এল। ঠিক করল রূপ আর সনাতনকে দর্শন করে গোবর্ধন

পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবে।

রূপ সনাতনের সঙ্গে দেখা হতেই তারা তাকে আটকে রাখল, মরতে দিল না। বললে, তার চেয়ে আমাদের কাছে প্রভুর লীলা-বিহার বর্ণনা করো। এত দিন তাঁর সঙ্গ করলে, শোনাও তাঁর সে-সব চিত্তচমৎকার কাহিনী।

তাই ভালো। তাই বলি।

অন্নজল ত্যাগ করল রঘুনাথ, ত্যাগ করল বস্ত্রবর্জন। আর গ্রাম্যবার্তা নয়, শুধু গৌরবার্তা। তিন ছটাক মাঠাই তার সারা দিনের আহার। প্রত্যহ নাম করে এক লক্ষ, দণ্ডবৎ এক হাজার। আর বৈষ্ণবদের উদ্দেশে দুই সহস্র প্রণাম। আর রাত্রি দিন রাধাকৃষ্ণের মানসসেবা। রাধাকুণ্ডে তিনসন্ধ্যা স্নান, আর ব্রজবাসী বৈষ্ণব দেখলেই আলিঙ্গন। দিবা-রাত্রির আট প্রহরের মধ্যে সাড়ে সাত প্রহরই ভজন আর চার দণ্ড মাত্র নিদ্রা—তা-ও সব দিন নয়। যেদিন লীলাবেশে মত্ত থাকে সেদিন তার ঘুমই ঘুম যায়।

কিন্তু এবার কে এল নীলাচলে?

এ যে বাপের সেই বল্লভ ভট্ট। কী চায়? কী বলে?

॥ ৭০ ॥

বল্লভ প্রভুর চরণবন্দনা করলে।

আর প্রভু তাকে ভাগবতবুদ্ধিতে অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তজ্ঞানে আলিঙ্গন করলেন।

বল্লভ বললে, 'কত দিন থেকে বাসনা তোমাকে আবার দেখি। জগন্নাথ সে বাসনা পূর্ণ করলেন। সন্দেহ কী, তুমিই ব্রজেন্দ্রনন্দন। তোমাকে স্মরণ করলে লোকে পবিত্র হয়। দর্শন করলে যে ফল তা বলাই বাহুল্য। তুমিই সংসারে কৃষ্ণনাম আনলে। কৃষ্ণের নিজের শক্তি ছাড়া কার সাধ্য তার নাম প্রবর্তন করে। সুতরাং তুমি কৃষ্ণশক্তির আধার। তোমাকে যে দেখে সেই কৃষ্ণপ্রেমিক হয়ে ওঠে। কৃষ্ণশক্তি ছাড়া কৃষ্ণপ্রেমের প্রকাশ হয় না। একমাত্র কৃষ্ণই প্রেমদানে সমর্থ, আর কেউ নয়। সুতরাং তুমি সকলের মনে কৃষ্ণপ্রেমের তুফান তুলছ তখন তুমি কৃষ্ণছাড়া আর কী।'

'কলিকালে ধর্ম—কৃষ্ণনামসঙ্কীর্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনে নহে তার প্রবর্তন॥

তাহা প্রবর্তাইলে তুমি, এই ত' প্রমাণ।
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি ইথে নাহি আন॥
জগতে করিলে কৃষ্ণনাম প্রকাশে।
যেই তোমা দেখে সেই কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে॥
প্রেম-পরকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে।
কৃষ্ণ এক প্রেমদাতা—শাস্ত্রের প্রমাণে॥'

প্রভু বললেন, 'তোমার ভুল হচ্ছে, আমি কৃষ্ণভক্ত নই, আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী। যদি কৃষ্ণভক্ত কেউ থাকে সে হচ্ছে অদ্বৈত আচার্য তাঁর সঙ্গ করেই আমার মন নির্মল হয়েছে। তাঁর কৃপার এমন শক্তি যে, ম্লেচ্ছকেও কৃষ্ণভক্ত করে দিতে পারে। আর নিত্যানন্দের কথা কী বলব? সে সাক্ষাৎ ঈশ্বর, সর্বদাই কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা। ভক্তির কথা সে বলতে পারে। আর বলতে পারে সার্বভৌম। ষড়দর্শনে সে পণ্ডিত, আমার সে ভাগবতোত্তম। সেই আমাকে বোঝাল কৃষ্ণভক্তিই সমস্ত সাধনের সার কথা। আরেক ভক্ত রামানন্দ। সে বোঝাল কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান আর প্রেমভক্তিই জীবের পুরুষার্থশিরোমণি। আর এই প্রেমভক্তি শুধু রাগমার্গে। সে আমাকে রাগমার্গের ভজন শেখালে। কিন্তু শিখলাম কই?'

বল্লভ ভট্ট সবিস্ময়ে তাকাল প্রভুর দিকে। মনে মনে বললে, 'শেখবার আর বাকি কী!'

'রামানন্দই বোঝালে', বললেন প্রভু, 'ঐশ্বর্যজ্ঞানে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পাওয়া যায় না। স্বয়ং লক্ষ্মী বক্ষোবিলাসিনী হয়েও ব্যর্থ হল। সে তো গয়লার মেয়ে নয়, সে যে সম্রাজ্ঞী। কিন্তু ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন শুদ্ধ প্রেমছাড়া কৃষ্ণকে বাঁধবে কে? শুধু পেয়েছিল যশোদা, পেয়েছিল তার সাথির দল।

'শুদ্ধভাবে সখা করে স্কন্ধে আরোহণ।
শুদ্ধভাবে ব্রজেশ্বরী করিল বন্ধন॥'

ঐশ্বর্য দেখলেও, যে শুদ্ধ ভক্ত, সে ঐশ্বর্যে আকৃষ্ট হয় না। তার কেবলা-প্রীতি। আর এই কেবলা-প্রীতিতেই কৃষ্ণ বশীভূত। এই সব নিরৈশ্বর্য প্রেমের কথা রামানন্দ শিখিয়েছে আমাকে। রামানন্দ তো শুধু শাস্ত্রজ্ঞ নয়, সে রসবেত্তা।'

বল্লভ ভট মাথা হেঁট করল। এ বুঝি তারই প্রতি ইঙ্গিত। এর অর্থ বোধ হয় এই যে শুষ্ক শাস্ত্রজ্ঞানে কিছু হবার নয়, চাই রসানুভূতি। রামানন্দ জ্ঞানে-রসে-তত্ত্বে-প্রেমে অনর্গল।

'আর দামোদর স্বরূপ? সে তো মূর্তিমান প্রেমরস।' প্রভু বললেন বিহ্বল-স্বরে; 'ব্রজের মধুর রসের সংবাদ আমি দামোদরের কাছেই জেনেছি। জেনেছি কাকে বলে গোপীপ্রেম। কামগন্ধের লেশমাত্র নেই, কৃষ্ণসুখই একমাত্র উদ্দেশ্য আর কৃষ্ণকে মাননীয় বলতে মর্যাদাবান বলতে তাদের অসম্মতি। এই তো গোপী-প্রেমের লক্ষণ। ভালোবাসার ভৎর্সনা করতে পর্যন্ত তারা প্রস্তুত। এই সর্বাতিশায়ী প্রেমের কথা দামোদর আমাকে বলেছে।'

বল্লভ মুগ্ধের মত তাকাল প্রভুর দিকে।

'আর হরিদাস আমাকে নাম শিখিয়েছে। ভাগবতপ্রধান হরিদাস, দিনে তিন লক্ষ নাম করে। তার প্রসাদেই আমি জানলাম নামের কী মহিমা। তারপরে বৈষ্ণবভক্তের দল—আচার্যরত্ন, আচার্যনিধি, গদাধর, জগদানন্দ, দামোদর, বক্রেশ্বর, শঙ্কর, কাশীশ্বর, বাসুদেব, মুরারি। এরাই জগতে অকুণ্ঠকণ্ঠে নাম প্রচার করল, এদের থেকেই শিখলাম কৃষ্ণভক্তি।'

বল্লভ ভট্টের মনে প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার ছিল, বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত আমিই ভালো জানি, ভাগবতের অর্থও আমার মত কেউ ব্যাখ্যা করতে পারে না। নিজের বিদ্যাবত্তা প্রচার করতে বোধ হয় তার এখানে আসা। প্রভু তা টের পেয়েছেন। কই তাকে তো কোনো 'বরণীয়' পাত্রজ্ঞান বলে তিনি স্বীকার করছেন না। তাঁর পার্ষদদেরই গৌরব দিচ্ছেন। যেন বলছেন, আমি কোন ছার, আমার থেকেও আমার পার্ষদেরা বেশি অভিজ্ঞ, বেশি রসগুণাকর।

'আপনার সে সব বৈষ্ণবেরা থাকে কোথায়?' ক্ষুব্ধস্বরে জিজ্ঞেস করল বল্লভ।

'এখানে যখন এসেছ তখন দেখতে পাবে।'

দেখা পেতে দেরি হল না। প্রভু-সকাশে এসে পড়ল বৈষ্ণবেরা। কী তাদের দেহজ্যোতি, বল্লভ বিশীর্ণ হয়ে গেল, ওদের কাছে সে সূর্যের কাছে খদ্যোতের মত।

প্রভু সকলের সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিলেন। এবার তবে প্রসাদ লাগাও।

মহাপ্রসাদের আয়োজন করল বল্লভ। গৌড়ভক্তেরা অঙ্গনে বসল সারি-সারি। প্রভুর এক পাশে অদ্বৈত আরেক পাশে নিত্যানন্দ। বল্লভ নিজেই পরিবেশন করতে লাগল। চতুর্দিকে উঠল হরিধ্বনি। নামানন্দের গর্জন।

রথযাত্রার দিন প্রভু কীর্তন করলেন, আর কীর্তনের সঙ্গে সে কী ভুবনভুলানো নৃত্য! সে কী প্রেমোদয়। বল্লভের মনে আর সন্দেহ রইল না, ইনিই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ।

যাত্রা-অন্তে বল্লভ প্রভুর কাছে গিয়ে নিবেদন করল, 'ভাগবতের কিছু টীকা লিখেছি, আপনাকে শোনাতে চাই।'

প্রভু বললেন, 'ভাগবতের অর্থ বুঝি আমার এমন সামর্থ্য নেই। তা ছাড়া আমি অধিকারীও নই যে, ভাগবতের অর্থ শুনি। আমি শুধু কৃষ্ণনাম নিই, তা-ও রাত্রিদিনে আমার সংখ্যা পূরণ হয় না।'

সর্বজ্ঞ প্রভু বুঝতে পেরেছিলেন বল্লভের টীকা সারশূন্য। বিদ্যা-বুদ্ধির জোরেই সে টীকা লিখেছে, ভজনান্বিত ভক্তির থেকে নয়। ভক্তিতে চিত্ত যদি নির্মল না হয় তা হলে ভাগবতের অর্থ তাতে স্ফুরিত হবে কী করে?

'আমার টীকায় আমি কৃষ্ণনামের বহু অর্থ করেছি।' বল্লভ অনুরোধ করল, 'তুমি একবার শোনে দয়া করে।'

প্রভু বললেন দৃঢ়স্বরে, 'আমি কৃষ্ণনামের বহু অর্থ মানি না। এক অর্থ শুধু মানি। সে হচ্ছে শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন। আর যদি কোনো অর্থ থাকেও তাতে আমার দরকার নেই।'

বিমনা হয়ে বল্লভ ঘরে ফিরে গেল। অপমান পুঞ্জিত হয়ে রইল হৃদয়ে।

যেহেতু প্রভু উপেক্ষা করেছেন, নীলাচলজন কেউ বল্লভের টীকা শুনতে রাজি হল না।

লজ্জিত ভট্ট দুঃখিত হয়ে গদাধর পণ্ডিতের শরণ নিল। বললে, 'তুমি কৃপা করে আমাকে বাঁচাও। শোনো আমার নামব্যাখ্যা। অন্তত তুমি যদি শোনো তা হলেও আমার এ কলঙ্কের স্খালন হয়।'

গদাধর সঙ্কটে পড়ল। কেউ যখন শুনল না, আমি শুনি কী করে?

কোনো মতামত পাবার আগে বল্লভ নিজের থেকেই পড়তে শুরু করল। দেখি কেমন না শোনো! গায়ের জোরে শোনাব।

গদাধরের সঙ্কট গুরুতর হল। অথচ শালীনতার খাতিরে বাধাও দিতে পারল না বল্লভকে। মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল, হে কৃষ্ণ, রক্ষা করো। প্রভুকে আমার ভয় নেই, তিনি অন্তর্যামী, তিনি বুঝবেন আমার অবস্থা—আমি শুনতে না চাইলেও আমাকে জোর করে শোনাচ্ছে, আমার অনিচ্ছাকে গ্রাহ্য করছে না। আমি বিনয়ী বলেই চুপচাপ আছি।

কেন চুপচাপ থাকবে? পার্ষদরা ক্ষমা করল না। কেন তুমি নিষেধ করবে না? নিষেধ করতে না পারো, স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে কী বাধা ছিল? এ কেমনতরো বিনয়, কেমনতরো চক্ষুলজ্জা?

গদাধর জানে এ তাদের প্রণয়রোষ, সত্যিকারের ক্রোধ নয়। তারা ছাড়া আর কে বেশি জানে গৌরের প্রতি তার কী দারুণ ভালোবাসা!

বল্লভ তবু নিরস্ত হয় না। শুধু শাস্ত্রজ্ঞানই বা মন্দ কী! বেশ, সেই শাস্ত্রজ্ঞানেরই বিচার হোক। তোমরাও তো সকলেই পণ্ডিত, বৈয়াকরণিক। এস, বিদ্যাবিচার করা যাক। ভক্তির কথা পরে দেখা যাবে, আগে যুক্তির কথা হোক।

পার্ষদদের তর্কে আহ্বান করল বল্লভ। দেখি তোমাদের শাস্ত্রজ্ঞানের দৌড়।

অদ্বৈত আচার্যকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করল: 'জীব তো কৃষ্ণের প্রকৃতি বা স্ত্রী। তাই জীব কৃষ্ণকে পতি বলে মানে। কী, যথার্থ তো?'

'যথার্থ।' বললে অদ্বৈত।

'যে স্ত্রী পতিব্রতা সে পতির নাম নেয় না। তোমরা কোন ধর্মে তবে কৃষ্ণের নাম নাও?'

অদ্বৈত বললে, 'তোমার সামনে যে মূর্তিমান ধর্ম বসে আছেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করো।' প্রভুর দিকে ইঙ্গিত করল: 'তিনিই সমাধান করে দেবেন।'

প্রভু বললেন, 'পতিব্রতা স্ত্রীর ধর্মই হচ্ছে স্বামী-আজ্ঞা পালন করা। এখানে স্ত্রীকে স্বামী আদেশ করেছে, নিরন্তর আমার নাম নাও। পতিব্রতা স্ত্রী সেই আদেশ পালন করছে, লঙ্ঘন করছে না। নাম নিচ্ছে আর তার ফল পাচ্ছে। ফল কী? ফল হচ্ছে প্রেমফল।'

বল্লভের মুখে আর কথা নেই। দুঃখিত হয়ে সে আবার বাড়ি ফিরল। প্রত্যহই আমি পরাজিত হই, এমন কি একদিনও হবে না যে আমার কথাই প্রবল হবে!

আরেক দিন গেল বল্লভ। দেখি এবার আমাকে কী করে ঠেকায়।

কে না জানে শ্রীধর স্বামীই ভাগবতের সর্বশ্রেষ্ঠ টীকাকার, ভক্তিপ্রেমের প্রচারক। প্রভুও তাই স্বীকার করেন, তাঁর পার্ষদরাও তদ্রূপ। সেই টীকা আমি খণ্ডন করেছি, যুক্তি প্রমাণ প্রয়োগ করে দেখিয়েছি তাঁর সিদ্ধান্তে দোষ হয়েছে। বেশ তো, বোসো স্থির হয়ে, শোনাচ্ছি এখুনি। তারপর একবার যখন আমার ব্যাখ্যা স্থাপিত হবে তখন দেখব তোমরা কী বলো। আমার প্রাধান্য তখন স্বীকার না করে যাও কোথায়?

'আমি ভাগবতে শ্রীধর ব্যাখ্যা খণ্ডন করেছি।' গর্বভরে বললে বল্লভ, 'দেখিয়ে দিচ্ছি তাঁর ব্যাখ্যায় পূর্বাপর সামঞ্জস্য নেই। আমি স্বামী মানি না।'

'ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যা করিয়াছি খণ্ডন।
লইতে না পারি তাঁর ব্যাখ্যান বচন॥
সেই ব্যাখ্যা করে যাঁহা যেই পড়ে জানি।
একবাক্যতা নাহি, তাতে স্বামী নাহি মানি॥'

প্রভু উপেক্ষার হাসি হাসলেন। বললেন, 'যে স্বামী মানে না, তাকে তো বেশ্যার মধ্যেই গণনা করা হয়।'

'প্রভু হাসি কহে—স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন॥'

অর্থাৎ যে শ্রীধর স্বামীর টীকা মানে না শাস্ত্রার্থের দিক থেকে সে ব্যভিচারী।

বল্লভ স্তব্ধ হয়ে গেল।

তার গর্ব চূর্ণ করে দিলেন প্রভু। মঙ্গলে-মাধুর্যে জগতের শোধন করবেন বলেই গৌর অবতীর্ণ। তাই নানা অবজ্ঞা-উপেক্ষায় বল্লভের অভিমান নাশ করলেন। গিরি গোবর্ধন ধারণ করে কৃষ্ণও একদিন ইন্দ্রের গর্ব চূর্ণ করেছিলেন। গর্বান্ধ জীব প্রথমে বুঝতে পারে না, পরে যখন অন্ধতা ঘুচে যায়, চোখ খোলে, তখন বোঝে কোথায় তার মঙ্গল। বোঝে আঘাতই প্রভুর হিতস্পর্শ।

বল্লভ বুঝল। আগে প্রয়াগে প্রভু আমাকে কত কৃপা করলেন, এখন আমার প্রতি কেন তাঁর বৈরূপ্য? প্রভুর সভায় বিদ্যা বিচার করবো, আমি জয়ী হবো, এই গর্বেই আমি ভরপুর ছিলাম, আমার প্রতি প্রভুর যে উপেক্ষা তা শুধু এই ঔদ্ধত্যকে শাসন করবার জন্যে। সকলের হিত করাই ঈশ্বরের প্রভাব, আমি মূর্খ, তাই আমি তাঁর হিতৈষণাকে সম্মান করি নি। ঠিক হয়েছে, আমাকে তিনি অপমান করেছেন।

'অপমান করি সর্ব গর্ব খণ্ডাইলা।'

এই অপমানই আমার মঙ্গল-মহৌষধ।

প্রভুর চরণে এসে পড়ল বল্লভ। বললে, 'আমি অজ্ঞ, তোমার সামনে আমি পাণ্ডিত্য প্রকট করতে চেয়েছিলাম। তোমার কৃপাফলে আমার গর্বান্ধতার মোচন হল। কৃপা করে আমার মাথায় তোমার চরণ রাখো।'

প্রভু কোমলার্দ্রনয়নে দৃষ্টিপাত করলেন। বললেন, 'তুমি একাধারে পণ্ডিত ও মহাভাগবত। পাণ্ডিত্য আর ভাগবততা এই দুই গুণ যার মধ্যে বর্তমান, সে গর্বিত হয় কী করে? শ্রীধর স্বামীর টীকার আনুগত্য স্বীকার করেই ভাগবত-ব্যাখ্যা সম্ভব। তুমি তাঁকে নিন্দা কোরো না, অতিক্রমও কোরো না। অভিমান

ছেড়ে কৃষ্ণভজন করো, নিরপরাধে করো কৃষ্ণকীর্তন।'

'যদি আমার উপর প্রসন্ন হলে', বললে বল্লভ, 'তবে আরেক দিন আমার নিমন্ত্রণ নাও। স্বগণসহ এস আমার কুটিরে।'

তাই গেলেন প্রভু।

প্রণয়স্থলে গদাধরের প্রতি রোষ প্রকাশ করলেন। কেন সে সেদিন বল্লভ ভট্টের টীকা শুনেছিল? ভেবেছিলেন উত্তরে গদাধরও রোষ প্রকাশ করবে। বলবে, আমি কী করব, জোর করে শোনালে আমার কী করবার আছে? কিন্তু গদাধরের রুক্মিণীপ্রভাব, সরল প্রভাব, তার রোষ না হয়ে ত্রাস হল।

রুক্মিণীরও তাই হয়েছিল। কৃষ্ণ বললে, 'তুমি কী ভেবে যে আমাকে মনোনীত করলে বুঝতে পাচ্ছি না। কত বিভূতিশালী রাজা তোমাকে প্রার্থনা করেছিল—শিশুপাল, শাল্ব আর জরাসন্ধ। কত তারা ধনী-মানী, রূপে-বলে সুসমৃদ্ধ। আমি তো নিতান্ত গুণহীন। রাজাদের ভয়ে আমি সমুদ্রে আশ্রয় নিয়েছি, বল-বুদ্ধি বলতে আমার কিছু নেই। আমি নিষ্কিঞ্চনেরও নিষ্কিঞ্চন। তুমি রূপোত্তমা, উত্তমে-অধমে মিত্রতা হয় না, পরিণয় তো দূরের কথা। বিদর্ভনন্দিনী, তুমি দূরদর্শিনী নও, তাই আমার মতন অভাজনকে বরণ করছ। আমি গৃহে-দেহে উদাসীন, স্ত্রী-পুত্রে আমার কামনা নেই, আমি আত্মলাভেই পরিপূর্ণ। সুতরাং কোনো ক্ষত্রিয় বীরকে ভজনা করো। আমাকে ভজনা করলে তোমার সুখ কোথায়?'

রুক্মিণী কৃষ্ণের পরিহাস বুঝল না। সে ভয় পেল। তার হাতের বালা শিথিল হল, তার হাতের ব্যজন খসে পড়ল মাটিতে।

বালগোপালের উপাসনা করত বল্লভ, গদাধরের সঙ্গপ্রভাবে কিশোর-গোপালের উপাসনা করতে ইচ্ছে হল। গদাধরকে বললে, 'আমাকে কিশোর-গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা দিন।'

গদাধর বললে, 'আমি পরতন্ত্র, প্রভুর অধীন। আমার প্রভু গৌরচন্দ্রের আদেশ ছাড়া দীক্ষা দিতে পারব না। তুমি যে আমার এখানে আস তাইতেই তিনি অসন্তোষ দেখান।'

স্বরূপ বললে, 'তোমার প্রতি প্রভুর যে রোষ সেটা কৃত্রিম। শুধু তোমাকে পরীক্ষা করবার জন্যেই তাঁর এই পরিহাস। তিনি দেখতে চান তুমিও ক্রুদ্ধ হও কি না।'

'আমি তাঁর সঙ্গে বিবাদ করব? তাঁকে দেখাব আমার ক্রোধ?' গদাধর

বিমর্ষ হয়ে গেল। বললে, 'তিনি যা দেন, প্রেম বা উপেক্ষা, ক্রোধ বা অনুরাগ, সবই শিরোধার্য করি। তিনি সর্বজ্ঞের শিরোমণি, তিনি জানেন আমার অন্তরে কী আছে!'

শুধু এতে হল না, গদাধর কাঁদতে-কাঁদতে প্রভুর চরণে গিয়ে পড়ল।

প্রভু তাকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, 'আমি তোমাকে খেপাতে চেষ্টা করলাম, তা, তুমি একটুও খেপলে না। কিছু বললেও না রাগ করে। সরল ভাবেই কিনে নিলে আমাকে।'

গদাধরের ভাবমুদ্রা প্রভুর বড়ই রুচিকর। প্রভুই আমার জীবনসর্বস্ব, গদাধরের ভাবে-ব্যবহারে তাই পরিস্ফুট। তারই জন্যে প্রভুর এক নাম 'গদাধর-প্রাণনাথ'। আরেক নাম 'গদাইয়ের গৌরাঙ্গ'।

এক ভুবনপাবনী গঙ্গা থেকে যেমন শত ধারা প্রবাহিত, তেমনি প্রভুর এক লীলায় বহুতত্ত্বের প্রকাশ। সৌজন্য, ব্রহ্মণ্যতা, দৃঢ়প্রেমমুদ্রা, অভিমান-প্রক্ষালন। বল্লভ যখন জোর করে তার টীকা পড়ছে, সৌজন্যবশতই গদাধর তাকে নিরস্ত করতে পারে নি। আর ব্রাহ্মণের প্রতি যথার্থ মর্যাদাবোধের থেকেই এই সৌজন্যের উৎপত্তি। নিষেধ করলেই বরং ব্রাহ্মণকে অসম্মান করা হত। তৃতীয়ত প্রভুর উপেক্ষাতেও গদাধরের প্রেম ম্লান হল না, শিথিল হল না। আর সবচেয়ে বড় শিক্ষা, উপেক্ষাতেই বল্লভের অভিমানপঙ্ক ধৌত হয়ে গেল।

বাইরের উপেক্ষাতে কী এসে যায় যদি প্রভুর অন্তরে অনুগ্রহ থাকে।

নিগূঢ় চৈতন্যলীলা কে বোঝে? গৌরে যার দৃঢ় ভক্তি তার কাছেই সমস্ত অর্থ পরিচ্ছন্ন।

প্রভুর সম্মতি মিলে গেল। বল্লভ গদাধরের কাছ থেকে কিশোর-গোপালের মন্ত্র নিলে।

এ আবার কে এল নীলাচলে?

এ যে দেখি রামচন্দ্র পুরী। পরমানন্দ পুরী তো আগেই এসেছে, সে-ও দেখি এখন উপস্থিত।

রামচন্দ্র আর পরমানন্দ দু'জনেই মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। রামচন্দ্র আগেই দীক্ষা নিয়েছিল বলে জ্যেষ্ঠবুদ্ধিতে পরমানন্দ তাকে প্রণাম করলে। প্রভুও তাকে দণ্ডবৎ করলেন।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ। তিনজনে তারপরে কতক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠী করলে, কৃষ্ণকথার আলাপন করলে।

জগদানন্দ এসে নিমন্ত্রণ করলে। জগন্নাথের প্রসাদ নিয়ে এল, প্রচুর প্রসাদ। একেবারে নিন্দা করবার উদ্দেশে রামচন্দ্র অত্যধিক ভোজন করলে। অবশেষ-প্রসাদ জগদানন্দকে খেতে দিলে, জগদানন্দও খেল পেট ভরে।

তারপরে রামচন্দ্র নিন্দা সুরু করলে—অতিভোজনের নিন্দা। শুনেছি চৈতন্যের লোকেরা বেশি খায়, তাই অতিথি-সন্ন্যাসীদেরও বেশি খাওয়ায়। স্বচক্ষে তাই দেখলাম এখন। বেশি খেয়ে ও বেশি খাইয়ে নিজের ও অন্যের দু'জনেরই ধর্মনাশ করে।

যে বেশি খায় তার বৈরাগ্য কোথায়? তাতে বৈরাগ্যের আভাসও নেই। বেশি খেলে শরীরে অবসাদ আসে, ব্যাধি আসে। আর দেহ যদি অবসন্ন বা ব্যাধিগ্রস্ত থাকে তা হলে বৈরাগ্য হবে কী দিয়ে?

'বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম সঙ্কীর্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর-ভরণ।'

নিজে আগ্রহ করে অত্যধিক খেল, অত্যধিক খাওয়াল, দোষ চাপাল জগদানন্দের উপর।

এমনি নিন্দক-স্বভাব রামচন্দ্রের।

মাধবেন্দ্রের অন্তকালে শিষ্য রামচন্দ্র এসেছিল। 'মথুরা পেলাম না—মথুরা কোথায়' বলে আক্ষেপ করছেন মাধবেন্দ্র। রামচন্দ্র তাঁকে উপদেশ করতে লাগল। শিষ্য হয়ে গুরুকে উপদেশ—কত বড় ঔদ্ধত্য। রামচন্দ্র ও-সব চিন্তা করেও দেখল না, বললে, 'তুমি কেন কাঁদছ? তুমি তো নিজেই পূর্ণব্রহ্মানন্দ, তোমার কিসের অভাব? যে চিদ্‌ব্রহ্ম সে কি কখনো কাঁদে?'

শুনে মাধবেন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তিনি ভগবানের দাস, ভক্ত, তাঁকে কি-না ব্রহ্মজ্ঞান করতে বলছে? 'দূর হ পাপিষ্ঠ।' মাধবেন্দ্র তিরস্কার করে উঠলেন: 'কৃষ্ণ পেলাম না, মথুরা পেলাম না বলে আমি আপন দুঃখে মরছি, এ কোথা থেকে জ্বালা বাড়াতে এল? আমাকে ব্রহ্মোপদেশ দিতে এসেছে। আমার দৃষ্টির থেকে বার হয়ে যা।'

রামচন্দ্রের দুর্বাসনা জাগল। আমি ব্রহ্ম—এই জ্ঞান লাভ করব তবে ছাড়ব। শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে গেল। কৃষ্ণের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখল না। আর অবিমিশ্র নিন্দুক হয়ে উঠল।

আরেক শিষ্য ঈশ্বরপুরীকে দেখ। অহোরাত্র মাধবেন্দ্রের সেবা করছে, মলমূত্র মার্জন করছে স্বহস্তে। নিরন্তর কৃষ্ণ-কথা বলছে, কৃষ্ণ-শ্লোক পড়ছে, কৃষ্ণ-স্মরণ-

সমুদ্রে নিমগ্ন করে রাখছে। পরম পরিতুষ্ট হয়ে মাধবেন্দ্র তাকে বর দিলে, 'কৃষ্ণে তোমার প্রেমধন হোক।'

মহতের নিগ্রহ ও অনুগ্রহের কী ফল তাই রামে-ঈশ্বরে দেখালেন মাধবেন্দ্র। রামচন্দ্র নিন্দার সাগর আর ঈশ্বর প্রেমের সাগর হয়ে উঠল।

পৃথিবীতে প্রথম প্রেমাঙ্কুর রোপণ করে চলে গেলেন মাধবেন্দ্র। সে অঙ্কুর পুষ্ট হল ঈশ্বর-পুরীরূপে। তারপরে ঈশ্বরপুরী থেকে দীক্ষা নিয়ে চৈতন্য ঠাকুর হয়ে দাঁড়ালেন পরিণত বৃক্ষ।

আর রামচন্দ্র কী করছে? সে শুধু পরের ছিদ্র সন্ধান করে বেড়াচ্ছে। এদিকে নিজের থাকা-খাওয়া সম্বন্ধে স্থিরতা নেই, সন্ধান করে ফিরছে কে কোথায় থাকে বা কী খায়? বিশেষ করে প্রভুর স্থিতি-গতি ভোজন-ভ্রমণই তার লক্ষ্যের বস্তু।

আর কিছু দোষ পেল না, একদিন প্রাতে গিয়ে দেখল প্রভুর ঘরে পিঁপড়ে হাঁটছে। আর যায় কোথা! রামচন্দ্র তখুনি সিদ্ধান্ত করল, কাল রাত্রে এ-বাড়িতে মিষ্টান্ন আনা হয়েছিল, তাই এই পিপীলিকার সার। মিষ্টান্ন আর কার জন্যে আনা হবে? নিশ্চয়ই কৃষ্ণচৈতন্যের জন্যে। কৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাসী হয়েও মিষ্টান্ন খাচ্ছে! মিষ্টান্ন খেলে ইন্দ্রিয় দমন হবে কী করে?

ঢাক পিটতে লাগল রামচন্দ্র। সন্ন্যাসী হয়েও মিষ্টান্ন খায়।

নিন্দে করে বেড়াচ্ছে, আবার কী নির্লজ্জ, নিত্য আসছে প্রভুর কাছে। আর প্রভু তাকে গুরুবুদ্ধিতে সম্ভ্রমসম্মান করছেন। প্রভু জানেন রামের কী ব্যবহার, তবু তাকে আদর করতে তাঁর কার্পণ্য নেই।

একদিন তো রাম মুখের উপর সরাসরিই বলে বসল। ঘরে যখন পিঁপড়ে হাঁটে তখন নিশ্চয়ই তুমি মিষ্টান্ন খাও। বিরক্ত সন্ন্যাসীর এ-কী ইন্দ্রিয়লালসা!

পিঁপড়ে স্বভাবতই যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়, তা নিয়ে আবার তর্ক কী। আর যে নিন্দা ভিত্তিহীন তাকে কেই বা মূল্য দেয়? কিন্তু, না, তবুও, প্রভুর মন সঙ্কুচিত হয়ে গেল। গোবিন্দকে ডাকিয়ে বললেন, 'আজ থেকে আমার ভিক্ষে হবে পিণ্ডাভোগের এক চৌঠি মাত্র, আর ব্যঞ্জন পাঁচ গণ্ডার। এর একতিল বেশি আনবে না। বেশি এনেছ দেখলেই আমি নীলাচল ছেড়ে চলে যাব।'

শুনে বৈষ্ণবেরা সকলে মাথায় হাত দিয়ে বসল। পিণ্ডাভোগ তো নিতান্ত ক্ষুদ্র অন্নের পাত্র। এত অল্পে প্রভুর জীবনধারণ হবে কী করে? সকলে রামচন্দ্র পুরীকে তিরস্কার করতে লাগল। কিন্তু উপায় কী?

তারপরে বরাদ্দ যেটুকু আনা হল, তারও অর্ধেক মাত্র প্রভু গ্রহণ করলেন। বাকি অর্ধেক গোবিন্দের জন্যে।

প্রভু অর্ধাশনে রইলেন। গোবিন্দও অর্ধাশনে। ভক্তবৃন্দ বললে, আমরাও তবে কোন সুখে পেট ভরে খাই।

গোবিন্দ আর কাশীশ্বরকে প্রভু বললেন, 'তোমরা অন্যত্র ভিক্ষে করে খিদে মেটাও।'

'তোমাকে ক্ষীণ দেখছি, অর্ধাশনে আছ না কি?' রামচন্দ্র প্রভুসকাশে এসে বিদ্রূপ করল: 'অর্ধাশনে থাকাও সন্ন্যাসীর ধর্ম নয়। অর্ধাশনে থাকলে শুষ্কবৈরাগ্য দেখা দেয় আর শুষ্কবৈরাগ্য তো ভোজনে বিঘ্ন ঘটায়। যথাযোগ্য আহার না পেলে শরীর রক্ষা হবে কী করে, ক্ষুধারই বা কিসে নিবৃত্তি হবে? আহারে-বিহারে নিদ্রায়-জাগরণে সমস্ত কর্মচেষ্টায় নিয়মিত হওয়াই তো যোগীর কাজ।'

'আমি অজ্ঞ।' বললেন প্রভু, 'আপনি যে আমাকে শিক্ষা দিচ্ছেন তাই আমি ভাগ্য বলে মানছি।'

পরমানন্দ পুরী এসে বসল। বললে, 'রামচন্দ্রের কথায় আপনি অন্ন ছাড়বেন কেন? ও নিন্দুক, ওর কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান নেই। খাইয়ে ও খাওয়ার নিন্দে করে, খেয়ে করে খাওয়ালোর নিন্দে। গুণের মধ্যে মিথ্যে করে দোষের আরোপ করে।'

'তোমরা কেন তাঁর দোষ ধরছ?' বললেন প্রভু, 'যতি হয়ে জিহ্বালম্পট হওয়া অন্যায়। প্রাণধারণের জন্যে যেটুকু দরকার সেটুকু মাত্রই সে গ্রহণ করে।'

'ঠ্যা, তাই তোমাকে গ্রহণ করতে হবে।' বললে ভক্তদল, 'রামের শাসনে তুমি যে সঙ্কোচ ঘনিয়েছ তা দেহরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নয়।'

ভক্তেরা পরিমাণ কিছু বাড়িয়ে দিল। আমাদের বাড়িতে-বাড়িতে তোমাকে নিমন্ত্রণ করছি, আমরা তোমার ভক্ত, আমাদের ইচ্ছামতই তোমাকে খেতে হবে। ভক্তদের আনন্দিত করতেই তো তোমার অবতরণ।

রামচন্দ্র নীলাচল ছেড়ে চলে গেল।

এদিকে গোপীনাথ সম্বন্ধে ঘোর দুঃসংবাদ এসে পৌঁছুল। রাজা প্রতাপরুদ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র তাকে 'চাঙ্গে' চড়িয়েছে।

তার মানেই গোপীনাথকে রাজাদেশে হত্যা করা হবে।

'চাঙ্গে চড়ানো' মানে মঞ্চে তোলা। মঞ্চের নিচে ধারালো খড়্গ পাতা আছে, তার উপরে গোপীনাথকে ফেলা হবে মঞ্চের থেকে। গোপীনাথ দু'-টুকরো হয়ে যাবে।

রায়-ভবানন্দের ছেলে আর রায়-রামানন্দের ভাই, গোপীনাথ কী অপরাধ করেছে?

প্রতাপরুদ্রের অধীনে মালজাঠা প্রদেশের শাসনকর্তা গোপীনাথ। প্রজাদের কাছ থেকে যথারীতি খাজনা আদায় করছে, কিন্তু রাজার প্রাপ্য কর ষোল আনা জমা দিচ্ছে না। বাকি পড়ে-পড়ে দু'লক্ষ কাহনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। হুকুম হলো বকেয়া বাকি শোধ করে দাও। কোত্থেকে দেবে? গোপীনাথ বললে, নগদ নেই, যদি সময় পাই জিনিসপত্র বেচে দিয়ে দেখতে পারি। দশ-বারোটা ঘোড়া আছে, আপাতত তাই নিতে পারো।

তাই সই, কিন্তু ঘোড়াগুলোর দাম কত হবে?

রাজপুত্র নিজে এল দাম কষতে। তার মুদ্রাদোষ ছিল, কথা বলতে ঘাড় বাঁকায়। থেকে-থেকে মুখ উঁচু করে।

সে একটা অকথ্য দাম বললে।

'এত কম?' দারুণ বিরক্ত হল গোপীনাথ। ব্যঙ্গ মিশিয়ে বললে, 'আমার ঘোড়া তো ঘাড় বাঁকায় না, ঊর্ধ্বমুখেও থাকে না। তাই মাপ করুন, পারব না বেচতে।'

রাজপুত্র ভীষণ ক্রুদ্ধ হল। রাজার কাছে গিয়ে লাগাল অনেকখানি করে।

'ছল করে টাকা দিচ্ছে না। রাজকোষের প্রাপ্য অর্থ আত্মসাৎ করেছে।' বললে রাজপুত্র, 'অনুমতি করুন ব্যাটাকে চাঙ্গে চড়াই।'

রাজা বললে, 'প্রাপ্য আদায় করতে যা ভালো মনে করো তাই করো।'

আর কথা নেই, মঞ্চে তুলেছে গোপীনাথকে। মঞ্চের নীচে খড়্গ পাতা।

সবাই প্রভুকে ধরল, 'এখন আপনি যদি রক্ষা করেন তবেই গোপীনাথ বাঁচে।'

'রাজার ন্যায্য প্রাপ্য যের নি, রাজা যদি শাস্তি দেয় তা হলে তাকে মন্দ বলতে পারো না।' প্রণয়রোষে বললেন প্রভু, 'রাজার জিনিস নিজে খেল, নৃত্য-গীতে অপব্যয় করল, এ তার কেমন দায়িত্ববোধ? একে তোমরা সমর্থন করো কী করে?'

এমন সময় একটা লোক ছুটতে-ছুটতে এসে বললে, 'শুধু গোপীনাথকে নয়, তার ভাই বাণীনাথকেও চাঙ্গে তুলেছে।'

প্রভু উদাসীন রইলেন। বললেন, 'রাজা সর্বমত তার নিজের প্রাপ্য আদায় করে নেবে, আমি নিষ্কিঞ্চন সন্ন্যাসী, তাতে আমার কী করবার আছে?'

স্বরূপ দামোদর ও অন্যান্য পার্ষদেরা কাকুতি করে বললে, 'রামানন্দ রায়ের গোষ্ঠীবর্গ সকলেই আপনার অনুগত। তাদের এই সঙ্কটে আপনার এ ঔদাস্য উচিত নয়।'

'তবে তোমরা কি বলতে চাও আমি রাজার কাছে গিয়ে গোপীনাথের জন্য দয়া ভিক্ষা করব?' ক্রুদ্ধ হলেন প্রভু: 'আঁচল পেতে কাহন মেগে নেব? আর রাজার কাছে সন্ন্যাসীর দাম কী? পাঁচ গণ্ডার সন্ন্যাসীর প্রার্থনায় দু'লক্ষ কাহন ছেড়ে দেবে?'

আরো একজন ছুটে এল।

'এক্ষুনি—এক্ষুনি গোপীনাথকে খড়্গের উপর ছুঁড়ে ফেলবে। প্রভু, তাকে বাঁচান।'

প্রভু বললেন, 'আমি ভিক্ষুক, আমার থেকে কিছু হবার নয়। তবে যদি তাকে বাঁচাবার ইচ্ছে তোমাদের সত্যই হয়ে থাকে, তবে তোমরা সকলে মিলে জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা করো। জগন্নাথই ইচ্ছাময়, করণ-অকরণের নিয়ন্তা তিনি।'

'ঈশ্বর জগন্নাথ—যাঁর হাতে সর্ব অর্থ।
কর্তুমকর্তুমন্যথা করিতে সমর্থ॥'

তক্ষুনি জগন্নাথ মন্দিরের সেবক হরিচন্দন পাত্র এসে হাজির। সে নিজের থেকেই চলল রাজার কাছে। গিয়ে বললে, 'গোপীনাথ তোমার সেবক, তার প্রাণদণ্ড নেওয়ার কোনো অর্থ হয় না। প্রাণ নিলে কি দেনা শোধ হয়ে যাবে? রাজকোষের ঘাটতি মিটবে? বরং ন্যায্য দামে ঘোড়া কিনে নাও, দেখ কতটা উঠে এল। বাকিটা না হয় আস্তে আস্তে দিয়ে দেবে। প্রাণ নিলে সুরাহাটা কোথায়?'

'সত্যি প্রাণ নিয়ে কী হবে?' রাজাও যুক্তির পথে এল: 'আমার ধনের প্রয়োজন। বেশ তো যাতে প্রাপ্যটা পাই তুমি তার ব্যবস্থা করো।'

হরিচন্দন ছুটে এল রাজপুত্রের কাছে। রাজার কথাটা বললে বুঝিয়ে। বেশ তবে তাই হোক, যথার্থ মূল্যে ঘোড়া দাও আর বাকি টাকা মেয়াদি কিস্তিতে পরিশোধ করো।

এদিকে প্রভু জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ বাণীনাথকে যখন বেঁধে নিয়ে গেল তখন সে কী করল, কী বলল?'

যে দেখেছে সে বললে, 'বাণীনাথ হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ বলতে লাগল। দুই হাতের আঙুলে সংখ্যা রাখছে, সহস্র পূর্ণ হলে দাগ কাটছে গায়ে।'

প্রভু আনন্দ করে উঠলেন।

কাশী মিশ্র এলে বললেন, 'আমার আর এখানে থাকা চলবে না। ভবানন্দ রায়ের বৃহৎ গোষ্ঠী, প্রায় সবাই কাজকার্য করে। কে কখন অন্যায় করে রাজার বিত্ত আত্মসাৎ করবে, রাজা দণ্ড দেবে, আর আমাকে তখন ডাকবে সেই দণ্ড মকুবের সুপারিশের জন্যে, সে অসহ্য। আমি তাই ভাবছি আলালনাথে যাব। এখানে বিষয়ীদের বচসা শুনতে আমার প্রবৃত্তি নেই।'

'তুমি এতে ক্ষুব্ধ হচ্ছ কেন?' বললে কাশী মিশ্র, 'যে বিষয়ের জন্যে তোমার কাছে আসে সে মহামূর্খ। তোমার জন্যে রামানন্দ রাজ্য ত্যাগ করল, সনাতন বিষয় ছাড়ল, রঘুনাথ পথের ভিখিরি হল। গোপীনাথও তোমার কাছে বিষয়বাঞ্ছা করে নি, সে তোমার কাছে চায় নি প্রাণভিক্ষা। ভক্তরা নিজের প্রেরণাতেই এসেছে, তোমাকে এসে বলেছে। যে শুদ্ধ-ভক্ত সে তোমার জন্যেই তোমাকে ভজনা করে, সুখ-দুঃখ যা আসে তাই মাথা পেতে নেয়। তুমি এখানেই থাকো। কেউ আর তোমাকে বিষয়কথা বলবে না।'

প্রতাপরুদ্র এল। যতদিন সে নীলাচলে থাকে ততদিন প্রত্যহ এসে সে কাশী মিশ্রের পা টিপে দেয়। সেদিনও টিপছে, কাশী মিশ্র সমস্ত প্রকাশ করল। বললে, 'প্রভু গোপীনাথের উপর ভীষণ রুষ্ট হয়েছেন। বললেন, রাজার থেকে মাইনে পায়, আবার কি না রাজার ধনই চুরি করে। রাজার দ্রব্য আত্মসাৎ করে আমার কাছে কি না রাজার বিচারের বিরুদ্ধে নালিশ জানায়। আমি আর এই বিষয়ীসঙ্গে থাকব না, আলালনাথে চলে যাব। এখন বলো, প্রভুকে কী করে ঠেকাই?'

প্রতাপরুদ্র মরমে মরে গেল। বললে, 'সমস্ত প্রাপ্য আমি ছেড়ে দেব; প্রভু

শুধু নীলাচলে থাকুন।'

কাশী মিশ্র বললে, 'প্রাপ্য ছেড়ে দেওয়ার প্রভুর সমর্থন নেই।'

'না, না, আমি প্রভুর দিকে তাকিয়ে ছাড়ব না, ভবানন্দ রায় আমার পূজ্য, তার ছেলেরা আমার প্রীতিভাজন সেই জন্যেই ছাড়ব। তুমি প্রভুকে আটকাও।'

গোপীনাথকে ডাকল রাজা। তাকে সম্মানের শিরোপা পরিয়ে দিল, বললে, 'তোমার সমস্ত ঋণ মকুব করে দিলাম। মালজাঠার শাসনভার তোমার উপরেই রইল। আর রাজার ভাণ্ডার যাতে না লুঠতে হয় তোমার মাইনে দ্বিগুণ করে দিলাম।'

কোথায় মঞ্চে তুলে খড়্গো ফেলে প্রাণ নিচ্ছে, তা নয়, উল্টে সমস্ত প্রাপ্য ছেড়ে দিল। শুধু তাই নয়, মাইনে দ্বিগুণ করল, পরিয়ে দিল সম্মানের শিরোবস্ত্র।

কাশী মিশ্র এসে নিবেদন করতেই প্রভু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তুমি এ কী করলে? রাজার নিকট থেকে আমাকে দান গ্রহণ করালে?'

কাশী মিশ্র হকচকিয়ে গেল।

'গোপীনাথ আমার সেবক, তাকে কৃপা না দেখালে আমি অসন্তুষ্ট হব, তারই জন্যে রাজার এই অনুগ্রহ। তা হলে এ প্রকারান্তরে আমাকেই দান করা হল।'

'তোমার মুখ চেয়ে গোপীনাথকে কৃপা করে নি রাজা', বললে কাশী মিশ্র, 'ভবানন্দের পুত্ররা তার প্রিয়পাত্র এই জানেই সে বদান্য হয়েছে। সুতরাং তোমাকে রাজদান গ্রহণ করতে হয় নি।'

রাজার আন্তরিকতায় প্রভু আনন্দিত হলেন।

পঞ্চ পুত্র সহ ভবানন্দ প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ হল। বললে, 'আপনার কৃপাতেই গোপীনাথের প্রাণরক্ষা হয়েছে। শুধু প্রাণরক্ষা নয়, পদোন্নতি হয়েছে। রামানন্দ আর বাণীনাথ আপনার চরণ আশ্রয় করে নির্বিঘ্ন হয়েছে, বাকি ছেলেগুলোকেও আপনার পদপ্রান্তে রেখে যাব।'

প্রভু ঈষৎ হেসে বললেন, 'সবাই বৈরাগী হলে তোমার বহু কুটুম্বকে খাওয়াবে কে?' উপদেশ করলেন: 'রাজার প্রাপ্য ধনকে নিজের প্রাপ্য ধন বলে বিবেচনা কোরো না। আর অসদ্ব্যয় কদাচ নয়।'

বর্ষান্তরে গৌড়ীয় ভক্তের দল আবার আসে প্রভুকে দেখে যেতে। অদ্বৈত আচার্য, আচার্যরত্ন, আচার্যনিধি তো বটেই, নিত্যানন্দ পর্যন্ত, যাকে কি না বলা আছে, এসো না, গৌড়ে থেকেই প্রেমভক্তি প্রচার করো। কিন্তু অনুরাগ অনুরোধ মানে না, প্রাণের টানে সমস্ত বিধি-বন্ধন ছিঁড়ে যায়। কতদিন গৌরকে

দেখি নি, কতদিন পাইনি তার সঙ্গসুখ, তাকে ভালোবেসেই তার আজ্ঞা লঙ্ঘন করি।

অনুরাগ কাকে বলে? যাকে সর্বদা অনুভব করা সত্ত্বেও মনে হয় আগে আর কখনো অনুভব করি নি, যাকে প্রতিমুহূর্তেই নবীন হতে নবীনতর মনে হয়, তাই অনুরাগ।

'অনুরাগের লক্ষণ এই বিধি নাহি মানে।
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গে তাঁর সঙ্গের কারণে॥'

যেমন গোপীরা করেছিল। রাস-রাত্রে কৃষ্ণের বাঁশি শুনে ঘর-বাড়ি ছেড়ে পাগলের মত বেরিয়ে এলে কৃষ্ণ তাদের আদেশ করল ঘরে ফিরে গিয়ে পতিসেবা করতে। কৃষ্ণানুরাগে সে আদেশ তারা অগ্রাহ্য করলে। বললে, যা হবার হোক, আমরা তোমার সেবা-সঙ্গ ত্যাগ করব না।

কৃষ্ণের আদেশ যে তারা অমান্য করল তাতে কৃষ্ণ কি সুখী না বিরক্ত? সুখী, যেহেতু আজ্ঞাভঙ্গের পিছনে যে অধিকতর অনুরাগ। কৃষ্ণ যে অনুরাগের বশীভূত।

'আজ্ঞা পালনে কৃষ্ণের যতেক পরিতোষ।
প্রেমে আজ্ঞা ভাঙ্গিলে হয় কোটিগুণ সুখপোষ॥'

ভক্তদলের মধ্যে আছে রাঘব পণ্ডিত, সে আবার ঝালি সাজিয়ে নিয়ে আসছে। তার বোন দময়ন্তী দিয়েছে ঝালি সাজিয়ে। আমসি, আচার, কাসুন্দি, শুক্‌নো কুল, রুখা-সুখা কত কী খাদ্যদ্রব্য, চিঁড়ে মুড়ি খৈ থেকে সুরু করে নাড়ু, গঙ্গাজল, কর্পূর-এলাচ পর্যন্ত। ঝালির উপরে মোহরের ছাপ দিয়ে দেওয়া। প্রকাণ্ড ভার, 'বোঝারি' বা মুটে তিনজন। মৌসিন বা মুনসিব বা ঝালির রক্ষক মকরধ্বজ।

ভক্তরা নরেন্দ্রসরোবরে মিলিত হয়ে প্রভুর সঙ্গে জলকেলি করল। আরেকদিন জগন্নাথের শয্যোত্থানের সময় বেড়াকীর্তন চালাল। সে কী হুঙ্কার-গর্জন-নর্তন-লম্ফন!

'কীর্তন-আটোপে ধরা করে টলমল।'

সাত সম্প্রদায়ে নৃত্য হচ্ছে—অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, বক্রেশ্বর, অচ্যুত, শ্রীবাস, সত্যরাজ আর নরহরি এই সাতজনে সাত সম্প্রদায়। প্রভু সকল সম্প্রদায়েই ভ্রমণ করছেন অথচ প্রতি সম্প্রদায়ই ভাবছে প্রভু শুধু আমার দলেই আবদ্ধ আছেন।

'হে সর্বচিত্তবিমোহন জগন্নাথ, তোমার নির্মাল্য যাই, তোমার চন্দ্রবদন দেখে মন প্রমত্ত হয়েছে।' ওড়িয়া পদকর্তার এই কথা কয়টি প্রভুর মনে পড়ল, স্বরূপকে বললেন তা গেয়ে শোনাতে।

আনন্দসাগর উথলে উঠেছে। যারা দেখছে-শুনছে, ভুলে গেছে দেহ-গেহের কথা। বেলা তৃতীয় প্রহর হল তবু নৃত্যের শেষ নেই। ভক্তদল শ্রান্ত হয়ে পড়ল। তখন ভক্তশ্রমের কথা শুনে প্রভু নিবৃত্ত হলেন।

স্নানাহার শেষ করে প্রভু গম্ভীরার দ্বার জুড়ে শুয়ে রইলেন। প্রভু শুলে গোবিন্দ প্রভুর পদসেবা করে এই নিয়মই চলে আসছে। এখন দ্বারজোড়া হয়ে পড়ে থাকলে গোবিন্দ ঢোকে কী করে? গোবিন্দ বললে, 'একপাশ হও, আমি ভিতরে যাই।'

প্রভু বললেন, 'আমার নড়বার শক্তি নেই।'

'তোমার পা টিপব যে।'

'তার আমি কী জানি!'

গোবিন্দ তখন তার বহির্বাস প্রভুর গায়ের উপর বিছিয়ে দিল, যেন তার পায়ের ধুলো না তাঁর গায়ে পড়ে। তারপর প্রভুকে লঙ্ঘন করে ঘরে ঢুকল। ঘরে ঢুকে প্রভুর কটি পিঠ টিপে দিতে লাগল। মধুর মর্দনে শ্রান্তি দূর হল, প্রভুর নিদ্রাকর্ষণ হল।

দণ্ড দুই পরে জেগে উঠে প্রভু দেখলেন গোবিন্দ তখনো বসে আছে। ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'এখনো বসে আছ কী। খেতে যাও নি?'

'কী করে যাই?' গোবিন্দ বললে কাতরমুখে, 'দরজায় শুয়ে আছ, পথ কই?'

'ভেতরে এসেছিলে কী করে? সেই ভাবেই যেতে পারতে না?'

'যাব তো খাবার জন্যে।' গোবিন্দ মনে-মনে বললে, 'তোমার সেবার জন্যে শ্রীঅঙ্গ লঙ্ঘন—অপরাধ করেছি, শাস্তি যদি কিছু থাকে সহ্য করব হাসিমুখে। কিন্তু নিজের উদরপূর্তির জন্য সে অপরাধ করব এ আমার ধারণার অতীত।'

বাইরে শুব্ধ হয়ে রইল গোবিন্দ। ভগবৎসেবী ভক্তের মনের কথা প্রভু নিজেই বুঝবেন ঠিক-ঠিক।

গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে প্রভু আবার গুণ্ডিচা-গৃহের ক্ষালন-মার্জন করলেন, বাগানে বনভোজন করলেন, রথের সামনে নৃত্য করলেন, দেখলেন কৃষ্ণজন্মযাত্রা।

ভক্তদের ইচ্ছে হল প্রভুকে খাওয়াই।

'গোবিন্দ, এ প্রসাদটুকু রাখো, প্রভুকে খেতে দিও।' কেউ পেঁড়া দিয়ে গেল, কেউ নাড়ু, কেউ পিঠে।

'অমুকে এটা দিয়ে গেলেন।' প্রভুকে জানায় গোবিন্দ।

প্রভু বলেন, 'ধরে রাখো।'

কত আর ধরবে! ধরতে-ধরতে ঘরের কোণ ভরে গেল। প্রায় শতজনের ভক্ষ্য স্তূপীকৃত হয়ে উঠল।

'আমার প্রসাদ প্রভুকে খাইয়েছ তো?' ভক্তের দল আবার খোঁজ করতে আসে।

'আমার মণ্ডা? সরভাজা?'

এটা-ওটা অন্য কথা বলে পাশ কাটায় গোবিন্দ।

'ভক্তদের আর কত বঞ্চনা করব?' গোবিন্দ একদিন প্রভুর কাছে গিয়ে দুঃখ জানাল: 'খাচ্ছ না অথচ খাদ্য সঞ্চিত হয়ে আছে, এ-কথা গোপন করে রেখে আর কত আমার অপরাধের বোঝা ভারী করব?'

'তোমার আবার অপরাধ কী!' প্রভু হাসলেন: 'তুমি তো আদবস্তু, অনাদিকাল থেকে আমার বশীভূত। নিয়ে এস কে কী খাবার দিয়ে গেছে। নাম ধরে ধরে নিবেদন করো।'

একে একে সকলের দেওয়া খাবার প্রভুর সামনে জড়ো করতে লাগল গোবিন্দ। বাসি-বিস্বাদ মানলেন না, শতজনের ভক্ষ্য প্রভু একদণ্ডে খেয়ে ফেললেন। জড়-বস্তুই পচে, চিন্ময়বস্তু পচে না। মহাপ্রভুর প্রসাদ চিন্ময়বস্তু।

'আর কিছু আছে?' জিজ্ঞেস করলেন প্রভু।

গোবিন্দ বললে, 'রাঘবের ঝালি আছে।'

'আজ থাক। পরে একদিন দেখা যাবে।'

পরে একদিন খোলা হল রাঘবের ঝালি। সমস্ত দ্রব্যেরই কিছু কিছু প্রভু উপভোগ করলেন এবং তা প্রায়ই এবেলা ওবেলা। ভক্তের শ্রদ্ধার দ্রব্য উপভোগ না করে উপায় কী। তারপরে ঘরে রান্না করেও অন্নব্যঞ্জন খাওয়াতে লাগল ভক্তেরা।

শিবানন্দ সেনও নিমন্ত্রণ করল।

বড় ছেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে দেশ থেকে, প্রভুর কাছে আনতেই প্রভু জিজ্ঞেস করলেন, 'কী নাম?'

'চৈতন্যদাস।' ছেলে উত্তর করল।